আমাদের অনাড়ম্বর

প্রচেষ্টা

- চতুর্থ সংখ্যা -

জানুয়ারি ২০২৩

প্রচেষ্টা

চতুর্থ বর্ষ,
প্রকাশকাল : জানুয়ারী - ২০২৩

সম্পাদক

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

সহ সম্পাদক

শেখর মাহাত, সৌমেন মণ্ডল

যোগাযোগের ঠিকানা

প্রচেষ্টা গ্রুপ,
রাজপাড়া, এড়গোদা, ঝাড়গ্রাম - ৭২১৫০৫, পশ্চিমবঙ্গ

সামাজিক মাধ্যম

Facebook page : Prochesta Edu Tech
Youtube : Prochesta Group
Whatsapp : 9007422922
Website : www.prochestagroup.com

কথোপকথন

৯৯৩২৬২৯৯৮১, ৯০০৭৪২২৯২২

চিঠি পাঠাবেন

প্রচেষ্টা গ্রুপ
রাজপাড়া, এড়গোদা, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৫০৫

অক্ষরসজ্জা

বিশ্বজিৎ মেট্যা, মুঠোফোন: ৯৪৩৪৬৮৪৩২২

ভ্রম সংশোধন

শুভঙ্কর মহাপাত্র

প্রচ্ছদ

চয়ন রায়, কলকাতা

অলংকরণ

সঞ্জয় মজুমদার, ঝাড়গ্রাম

বইটি পাবেন

নন্দন ডিজিট্যাল জোন, এড়গোদা, ৮১৪৫৯৭৬২৮৫
রয়্যাল কম্পিউটার, মেদিনীপুর, ৮১১৬৭৬৮৩৮৮
সৌমেন মণ্ডল, ঝাড়গ্রাম, ৮৯৭২৯০৫৮৫৫

বিনিময় - **১০০.০০** টাকা মাত্র

উৎসর্গ

যাঁদের ত্যাগ ও আদর্শ এই পত্রিকা প্রকাশের
একমাত্র ভিত্তি, যাঁদের দ্বারা আমরা
প্রতি মুহূর্তে প্রাণিত হই —
এই পত্রিকা তাঁদের —
উদ্দেশ্যে উৎসর্গ
করলাম।

সম্পাদকীয়

সমস্ত শুভানুধ্যায়ী, সদস্য-সদস্যা, পরামর্শদাতা, লেখক-লেখিকা, শিল্পী-সর্বোপরি যাঁদের সার্থক প্রচেষ্টায় এই পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করছে তাঁদের প্রত্যেককেই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমরা আন্তরিকভাবেই চেয়েছি পত্রিকাটি সার্বিকভাবে সুন্দর হয়ে উঠুক। তবু এ পত্রিকায় কোনোরকম অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি বা মুদ্রণপ্রমাদ থেকে থাকলে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

কথা প্রসঙ্গে

করোনা নামক অতিমারীর মত দস্যুকে পরাজিত করে আস্তে আস্তে মা ধরিত্রী তার নিজের ছন্দে এগোতে শুরু করেছে। "মাগো আজ মন বসেনা" বলেই ক্ষান্ত থাকতে হয়। "প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল" সুর সাম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, বাপী লাহিড়ী থেকে কে .কে . দের। কার্টুনিস্ট নারায়ণ দেবনাথ থেকে ফুটবলার সুরজিৎ সেনগুপ্ত দেরকে হারিয়ে আমরা এখন প্রতিটি ক্ষেত্রেই সত্যিকারের অভিভাবক হীনতায় ভুগছি।

"স্মরণ বীণার তন্ত্রীতে তুমি বাজো,
মরণ তোমায় হরণ করেনি আজও।"

-একথা বারে বারে উচ্চারিত হয়। উনারা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেও বাংলা ও বাঙালির স্মরনের মনিকোঠায় অমরত্ব লাভ করেছেন।

'প্রচেষ্টা'-২০২০ সালে আকন্ঠ গরল পান করে জন্ম আমার। আমার জন্মদিন অনাড়ম্বর ভাবেই পালিত হয় বলে একবিন্দুও দুঃখ হয়না বরং গর্ব অনুভব করি। স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতায় সকলকে আচ্ছাদিত করার অভীপ্সায় এগিয়ে চলার সাহসই হল " আমাদের অনাড়ম্বর প্রচেষ্টা" । তিন পেরিয়ে চার বছর বয়সেও একই রকমের ভালোলাগা ও ভালোবাসায় আমি আপ্লুত। ছোটদের ভালোবাসা ও বড়োদের আশীর্বাদে আমার দিনযাপন হয়। "আমরা জীবনকে নিজের মতো করে সাজাচ্ছিলাম, সাজাতে থাকব। তাই সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্যে আমাদের কাতর আবেদন থাকবে-

"এসো যুগান্তের কবি,
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ঐ মানহারা মানবীর দ্বারে,
বলো ক্ষমা করো-
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার পূন্যবানী।।"

সাহিত্য - আমার 'মা'। তার সমস্ত নির্যাস আমার শরীরে। তাই বলি

"হে জননী
আমরা ভয় পাইনি।
যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটেছে বলে আমরা বিরক্ত।
মুখ বন্ধ করে
অক্লান্ত হাতে - হে জননী
আমরা ভালোবাসার কথা বলে যাব।।"

আমাদের 'প্রচেষ্টা' কেবল লিটল্ ম্যাগাজিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সামাজিক দায়বদ্ধতায় আর সকলের সাহায্য ও সহযোগিতায় - সচেতনতামূলক প্রচার ত্রাণ বিতরণ, পুস্তক বিতরণ- গ্রন্থযাত্রা, বস্ত্রদান ও বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি কর্মসূচি করে চলেছে আর ভবিষ্যতেও করে যাবে প্রচারের জৌলুসতায় নয় নিজস্ব ছন্দে ও নিরলসভাবে।

"শিক্ষা আমাদের উদ্দেশ্য ও সাফল্য আমাদের লক্ষ্য।"-এটাকে আঁকড়ে ধরে

এগিয়ে চলার নামই 'প্রচেষ্টা'। 'প্রচেষ্টা' তার ভাবী বনস্পতি হয়ে ওঠার লক্ষ্যে অবিচল থেকে সমাজকল্যাণে ও মানবহিত সাধনের চেষ্টা অক্ষুণ্ণ রাখতে বদ্ধপরিকর।

"আমাকে বিদ্রুপ করুক-
কুঠারে কুঠারে আমার ধৈর্য্যকে করুক আহত"

তা সত্ত্বেও আমার প্রাণপ্রিয় শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, পাঠক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের উৎসাহে আমি হব আগামীর বনস্পতি।

যাইহোক একবছর ধরে জমে থাকা অব্যক্ত কথা সব লিখে শেষ হবার নয়। তাই আর কথা বাড়ালাম না।

শ্রদ্ধেয় কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, মুদ্রন সংস্থার সকলকে এবং পাঠকদের যথাযোগ্য স্থানে প্রণাম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই।

"যদি কিছু ভুল থাকে প্রতিকূল তা আমারই দুর্বলতা,
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যদি কারো প্রাণে ব্যাথা দিয়ে থাকি কভু,
আজি এ লগনে নিয়ো নাকো মনে-
ক্ষমা করো বারে প্রভু।"

ধন্যবাদ।

নমস্কারান্তে—
প্রচেষ্টার পক্ষে
মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী

বিজ্ঞাপন বিহীন পত্রিকার জন্য ধন্যবাদ। কাঁচা, ডাঁসা, পাকা ও অতিপাকা ফলভারে সজ্জিত এক নবীন সুন্দর বৃক্ষ 'প্রচেষ্টা'। গ্রাম শহরে এটার বহুল প্রচার ও প্রসার একান্তই প্রয়োজন। নিয়মিত ও নির্ভুল প্রকাশ অবশ্যই কাম্য। আর্থিক ডামাডোলের বাজারে এটা একটা দুর্দম পদক্ষেপ এবং অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় বিষয় সন্দেহ নাই।

ভরত চন্দ্র মাহাত

সূচিপত্র

কবিতা

অ্যালবাম	বেবী সাউ	১১
অকালপক্ক দর্শনে	মনতোষ মণ্ডল	১১
বোধ যখন বিস্ময়	সোমা বিশ্বাস	১১
মুক্ত ভালোবাসা	প্রীতি দাঁ	১২
জয়তু ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭	অরুণাভ বীর	১৩
লাশকাটা ঘর	সুদীপ্ত বিশ্বাস	১৩
সিধু ও কানু	অজিত কুমার রাউৎ	১৪
যারা হাঁটতে বেরিয়েছে- তাদের সঙ্গে একদিন	মানবেন্দ্র পাত্র	১৫
দুগা ঠাকুর ...	সুব্রত কর্মকার	১৬
মাধবীলতা	নিসর্গ নির্যাস মাহাতো	১৭
সু-নীল	রিম্পা ষড়ংগী	১৭
দুগাপরব	শাশ্বতী হোসেন	১৮
কথোপকথন বৃষ্টি ভেজা স্বপ্ন	ড. সোমনাথ দে	১৯
নগ্ন ইতিহাস	পতিতপাবন মাহাত	১৯
মন্থন	অনিমেষ সিংহ	২০
কাছের মানুষ অথবা অসমর্থিত সূত্র	দেবাশিস দণ্ড	২০
আঁখির পানি	খগেন জানা	২২
বৃষ্টিঋণ	ঋতশ্রী মান্না	২২
পুষ্প পিতা	খুকু ভূঞ্যা	২৩
মায়ের মুখ	মৌপর্ণা মুখোপাধ্যায়	২৩
অহৈতুকী	শ্রীতনু চৌধুরী	২৪
সুতো	রাজা ভট্টাচার্য	২৪
জলরং ছবি ও কবিতা	ড. শান্তনু ভৌমিক	২৫
দেখলে হবে	মন্দাক্রান্তা সেন	২৫
ফিরব বললে ফেরা যায় না	সোনালী ঘোষ	২৬

মুখর বাদল দিনে	আশিস মিশ্র	২৬
সুঁই /কলহ/চাকা/সুখ/জিজিবিশা	উদয় শঙ্কর রক্ষিত	২৭
শান্ত হও	প্রসাদ সিং	২৭
হুলের গান	বিনোদ মন্ডল	২৮
অবচেতনে	সুদীপ্তা মাহাত	২৮
আহ্বান	সাগর মাহাত	২৯
রাত্রির ভিতরে এসে যদি আরো . . .	জয়ন্ত দাস	২৯
গোপন ইচ্ছে	দেবব্রত দত্ত	৩০
না	মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী	৩০
ভালো শেষে ভালো সব	প্রবীর কুমার দত্ত	৩১
যাত্রামোদী বুধার বাপ	নীলেন্দু মাহাত	৩১
রাতের তারা-রা	সৌমেন মন্ডল	৩২
স্বাধীনতা মানে	পুরন্দর ভৌমিক	৩৩
মাঝে মাঝে কেন	সীমা সোম বিশ্বাস	৩৩
দিগন্তরেখা	মুকুন্দ কর	৩৪
এখন	ভিক্টর মাহাত	৩৪
যুদ্ধের পর	রাজেশ মাহাত	৩৫
ভারতবর্ষ	প্রসাদ মল্লিক	৩৫
অন্তর	চয়ন রায়	৩৬
লবা	রাজুরানা দাস	৩৭
আঙুলে বর্ণমালার মিছিল	কমলেশ নন্দ	৩৮
মানুষ আসলে . . .	সৌমেন শেখর	৩৮

গল্প প্রবন্ধ ও নাটক

পক্ষান্তর	শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০
ভালোবাসার জিনিস	দেবাশিস দে	৪০
প্রেম প্রেম	সুমন রায়	৪০
এমন একটা মানুষ থাকুক	কেয়া রায়	৪১

দৃশ্যায়ন	মিঠু মণ্ডল	৪২
স্বপ্ন	জাহির মল্লিক	৪৩
উত্তর চাই	পার্থ সারথি চক্রবর্ত্তী	৪৬
সর্বজনীন	অমৃত ঘোষ	৪৮
স্বপ্ন	বিশ্বজিৎ দাস	৪৯
স্বামী বিবেকানন্দের বাস্তবিক বেদান্ত ও মানবধর্ম	তমাল চক্রবর্ত্তী	৫২
আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই': আগমনেই আবির্ভাব	স্বপনকুমার মণ্ডল	৫৬
নিগৃহিতা নারীপ্রগতি ও তার নগ্নায়ন : একটি মনস্তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা	ড. শুভেন্দু ঘোষ	৬২
জঙ্গল মহল	নলিনী বেরা	৬৭
ভারতের স্বাধীনতা	অমল নাহা রায়	৭১
ভারতের স্বাধীনতা ও জঙ্গলমহল	অমর সাহা	৭৩
স্বাধীনতা সংগ্রামে জঙ্গলমহল ঝাড়গ্রাম	ড. মধুপ দে	৭৬
জনশ্রুতির সত্যতা অন্বেষণ	উপেন পাত্র	৮৫
ভারতের স্বাধীনতা ও জঙ্গলমহল	নারায়ণ মাহাত	৮৮
ঝাড়গ্রাম ও স্বাধীনতার লড়াই	ড. অমৃত কুমার নন্দী	৯০
ঔপনিবেশিক শাসনমুক্তির ডাকে নিমক ও জঙ্গলমহাল	ড. ছন্দা ঘোষাল	৯৫
স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ ও আদিম জনজাতি	ড. শান্তনু পাণ্ডা	১০৩
ঝাড়গ্রামে আদিবাসীদের বাহা পরব	সমীরণ দত্ত	১০৭
পোড়ামাটির হাতি ঠাকুর-এক আদিম লোকবিশ্বাস	রাকেশ সিংহ দেব	১১১
শতবর্ষে ঝাড়গ্রাম : স্বাধীনতা সংগ্রাম	হরিপদ ঘোষ	১১৪
গ্রন্থাগার	হরিশঙ্কর দে	১১৭
আমরা করবো জয় (একাঙ্কিকা)	রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১২০

কবিতা

অ্যালবাম
বেবী সাউ

হঠাৎ করে আঁধার ডাকে মন
অভিসারের পথটি আঁকাবাঁকা
ওপাশে আজ পুজোর খেলা সেরে
নিজেই ভরি নিজের বীরগাথা

জীবন মানে লিখিত এক ছবি
দৃশ্য দিয়ে সাজা নাট্যকার
স্ক্রিপ্ট জানি, তাও ভুলের বশবর্তী
উলটপালট হলো সেটের তার

দিনের শেষে হিসেব পড়ে থাকে
রাধার বাঁশি লিখছে উপকথা
পাড়ার মোড়ে দুখিনী সেই মেয়ে
কয়েদ শেখে অথবা চাটুকথা

একাই আজ জীবন লিখি তাই
জীবন মানে জ্যান্ত সংবিধান...

বোধ যখন বিস্ময়!
সোমা বিশ্বাস

ক্রমাগত আঁচড় দিয়ে যাচ্ছ..
টের পাচ্ছো না
দূরে যাওয়ার প্রস্তুতি
তাই আসছে মনে, মন মানছে না!

ভাবনার জন্যই ভাবনা হয়
বৃষ্টি পড়ে মনের ভেতর;
বাহির করে জয়!
মনের মধ্যে আনাগোনা অনেক ভাবনা
তবে সে ভাবনায় ফাগুন নেই;
আছে আগুন আর যন্ত্রণা-

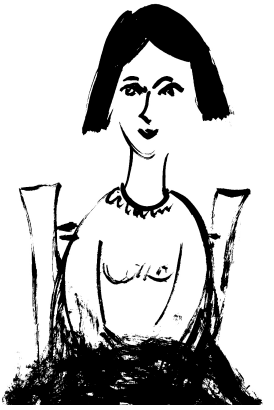

অকালপক্ক দর্শনে
মনতোষ মন্ডল

চেহারা গুলো বাঁক নিয়েছে উল্টো পথে ,
মুখোশ গুলো চেহারা খুঁজছে উল্টো রথে।
অবাঞ্ছিত আধো কথার দল
পথ খুঁজে ফিরে তাকাবার ...
বড় আলোতে মুখ জ্বলেছে বারংবার,
কাদা ছোঁড়াতে অসাম্য সুখের পারাপার।

আলপনা আর পড়বেনা বড় বড় দেওয়ালে-
মনের কদাচলে অমৃত পানের অভিপ্রায় -
দংশানো কালো দাঁতে চরিত্রের সতীত্বতা।
আনমনে বয়ে চলে জীবন
যন্ত্রনা সহে নেয় অসহায় মন...

কে কার দরজায় টোকা মারে নির্বাণে!
কে কার চোখে সাঁতরায় সন্তর্পণে ?
কথার আগোছালো ইশারায় দিন গুনে সখ্যতা,
কামের উদ্দীপ্ত সমরেণু পাশ ফিরে পায় ব্যর্থতা।

শত্রুর সাথে মিত্রদের অভদ্রতা...
যোগ্যতার মরনপণেও বেঁচে নেই সভ্যতা,
অকালপক্ক দর্শনে নিভৃতে পালন নিরবতা...!

মুক্ত ভালোবাসা

প্রীতি দাঁ

কোথায় গেলে পাবো বলতে পারো একটুখানি শান্তি একটুখানি স্বস্তি!
আমার হাতে পায়ে পরানো দীর্ঘদিনের শক্ত শিকলের বেড়া
তোমারও চোখ এড়াইনি সেই পায়ের দিক থেকে।
তুমিও একদিন বললে একি!! তোমার পায়ে যে পরানো শিকলের বেড়া ?
আমিও বললাম তুমি আর সবার মতো আমার পাটাই দেখলে।
আমার মনটা পড়লে না একবারও জানতে চাইলে না,
তুমিই অনেকক্ষণ চাইলে ভাবুক হয়ে গেলে যেনো একেবারেই ?
বললে কোথায় তোমার এই শিকলের তালার চাবি ?
আমিও বললাম এটা যে বড্ড শক্ত, কখনো এই শিকলের চাবি তুমি পাবেনা
এই যে সমাজের বেড়াজাল সবটাই তোমার আমার মতো মানুষের তৈরি।
তুমি বললে তবে কি আমাদের আর ভালোবাসা হবেনা ?
আমিও তোমাকে বললাম ভালোবাসা কেনো হবেনা বলোতো ?
ভালোবাসা যে স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা যে বড্ড পবিত্র অনুভূতি।
তুমি বললে আমি যে কেবল তোমাকেই ভালোবাসতে চাই!
আমি বললাম তুমি পারবে আমার এই শক্ত শিকলের তালা ভাঙতে ?
তুমি বললে ভালোবাসলে কি এই তালা সত্যিই ভাঙতেই হবে ?
আমি বললাম তবে তুমিও সেই পুরুষ নও, ফিরে যাও তুমি।
তুমি পারবে না তুমিও ভাঙতে পারবে না এই শিকলের তালা
আমার দীর্ঘদিন কেটে গেছে প্রতীক্ষায়, আমি ঠিক পারবো আরো অপেক্ষা করতে।
আমি সেই কবে থেকে সেই সুদর্শন যুবকের অপেক্ষা করছি!
যে পারবে আমায় মুক্ত করতে, আমায় এমন একটা পৃথিবীতে নিয়ে যাবে,
যেখানে থাকবে না একটাও বানানো নিয়ম, একটাও অন্ধকুসংস্কার।
যেখানে পৌঁছতে পারবে না নিয়মিত কন্যা শিশুর কান্না।
তুমি বললে আমি নিয়ে যেতে পারবো, আমি তোমাকে মুক্ত করবো!
আমি বললাম তুমি পারবে প্রত্যেক কে মুক্ত করতে, আমি একা মুক্ত হবো কিভাবে ?
আমি বললাম ভালোবাসা বন্দি হয়না, তুমি পারবে না, তুমি ফিরে যাও।
যদি বুঝতে পারো ভালোবাসা অরণ্যের মতো অনন্ত অসীম।
আমার মতো করেই যদি প্রত্যেক কে ভালোবেসে আপন করতে পারো,
ছড়িয়ে দিতে পারো অসুখের মতো, মুক্ত পৃথিবীতে যদি ভেসে যায় ভালোবাসা।
সেদিন এই পৃথিবীর সাথে সাথে আমিও মুক্ত, সেদিন মুক্ত আমাদের ভালোবাসাও।

জয়তু ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭
অরুণাভ বীর

শৃঙ্খলের উচ্ছলিত ধ্বনি মারলো চাবুক
শোষকের শোষিত ক্রীতদাসকে,
রক্ত পিপাসুদের রক্তিম ক্যানভাসে ফুটে উঠলো সবুজ সান্নিধ্য,
চিতার হিংস্র আগুন নিভে গেল কোটি কোটি পায়রার চাবুকের হাওয়াতে,
শহীদের প্রাণের আলোয় উদ্ভাসিত হলো আমাদের মানচিত্র
প্রভাতের স্নিগ্ধতায় তিন-রঙের তুলিতে লিখে ফেললো ছন্দোময় কবিতা,
স্বাধীন ধ্রুবতারা সে'দিন উদিত হলো নব ভারতের আকাশে।

লাশ কাটা ঘর
সুদীপ্ত বিশ্বাস

একদিন আমার বদলে বিছানায়
শুয়ে থাকবে আমার লাশ।
একদিন আমিও নিশ্চিন্তে
শুয়ে থাকব ওই লাশ কাটা ঘরে,
অন্যান্য লাশের পচা গলা গন্ধ
বেমালুম ভুলে গিয়ে।

যত বার হেঁটে গেছি মর্গের রাস্তায়
নাকে চেপে ধরেছি রুমাল
পেরিয়ে গিয়েছি খুব দ্রুত।

যতই এড়িয়ে চলি, যতই ছুটি না কেন
একদিন ঠিক পৌঁছে যাব
ওই লাশ কাটা ঘরে।

সিধু ও কানু

অজিত কুমার রাউৎ

মোরা সাঁওতাল হারাচ্ছি জমি অধিকার থেকে বঞ্চিত
মোরা ভোগ করি শাসন নিপীড়ন হই মোরা শোষিত।
বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে মোদের সর্বাঙ্গে
চুপচাপ থাকব না আর ঝাঁপিয়ে পড়ব রণাঙ্গনে।
নীরবে সহিতে মোরা জন্মায়নি এই ভূমে
রুধির ধারা দিয়েই লড়ব মোরা রণ ভূমে।
মা বোনেদের ইজ্জত আব্রু তোরা ভেবেছিস বড়ই সস্তা
আর দেব না লুন্ঠিত হতে পালাবার তোদের নাই রাস্তা।
জান দেবো তবু মান দেবো না মানের মূল্য অতুল্য
তোরা সবে মিলি নষ্ট করিস দেশের মায়ের অমূল্য।
শুনে রাখ তোরা জমিদার জোতদার মহাজন ইংরাজ
জল জমি জঙ্গল তোরা সব নিচ্ছিস ছিনিয়ে ধড়িবাজ।
সিধু কানু আজ ধরেছি ধনুক ভেবেছিস তোরা বন্য
শত বাধা মোরা পেরিয়ে যাবই হয়েছি অগ্রগণ্য।
হারিয়েছি মোরা মোদের অধিকার এবার নেব কেড়ে
জ্বলিতেছে বুকে বিদ্রোহ আগুন ভেবেছিস দেব ছেড়ে ?
নহে নহে নহে হইবে না তাহা লড়িব ধনুক তীরে
রোদ জল সব সয়েছি লড়িব এবার বীরে।
বিচারের নামে নির্যাতন আর সহিব না এ চিত্তে
ইচ্ছে মতন জোর জুলুমে পারবি না আর কিনতে।
মানুষ তো তোরা নোস লুটেছিস নারীর ইজ্জত
পশুর চেয়েও অধম তোরা লড়িব আমরা আছে হিম্মত।
গায়ে আছে অশেষ বল লড়ব চোয়াল শক্ত করে
মায়ের বোনের সব সম্মান নেব আদায় করে।
অধিকার আমরা নেব কেড়ে শোন রে মহাজন জমিদার ব্রিটিশ
ভেবেছিস তোরা নেই কোনো ভয় ভেবেছিস তোরা পৃথ্বীশ ?
শোন রে তোরা জেগেছি আমরা হাজার হাজার সাঁওতাল
বিক্রমে আজ করেছি শপথ বাজাব মোরা করতাল।
তেজারতি তোদের লাফিয়ে চলে এবার থামা গতি
সাঁওতাল জেগেছে পড়ব ঝাঁপিয়ে নাই মোদের ভীতি।
হচ্ছি উৎখাত নিজ ভূমি হতে লাগে বড়ো বুকে ব্যথা
জানিস ইতিহাস লেখা রবে পাতে মোদের বীর গাথা।

যারা হাঁটতে বেরিয়েছে– তাদের সঙ্গে একদিন

মানবেন্দ্র পাত্র

১.
মুক্ত বাহুর - অঢেল আকাশ
ভীষণ চেনা, তোমার আমার
উচাটনের বেজে ওঠা—
মগ্ন বিলাপ, মন্ত্রগুলো।

ফুলের বনে হাঁটছে যারা এখন তারাও
ফুলের মতো,
জড়িয়ে আছে প্রাচীনতম
প্রাকৃত-আলো।

আমরা কেবল হাঁটতে পারি, গাইতে পারি — যে যার মতো।

২.
হারিয়ে যাবে! হারিয়ে যেও।
মুক্তবাহু ছড়িয়ে দিও
মগ্ন তুমি, নগ্ন তুমি
দু'হাত বাড়াও
ঐ যে যারা হাঁটতে গেছে তেপান্তরে
নীলের দেশে— মুক্ত হাওয়ায়
আমরা যদি তাদের মতোই, দোষ করে নিই
মায়ার কাছে বসে থেকে পাপ করে নিই।

ফুলের ফুটে ওঠা দেখে
কেমন যেন ঘোর লেগে যায়।

দু'হাত দিয়ে কার কি হবে ?

পারলে এসো একই সাথে হাঁটতে বেরোই।

দুগা ঠাকুর...

সুব্রত কর্মকার

(১)
লুলুর মা ত বইল্ল বড়
হাত পা চালাও লড়চড়।
আমি নাকি ঘর কুনাটা,বেশ
ঘরে বসেই দুগা পূজা শেষ!

লিলম ভাড়া একটা গাড়ি
যাতেই হবেক তাড়াতাড়ি
গিধনি যাব,ঝাড়েগগেরাম
ফুলকুশমা আরেকটা নাম।
ঘুরেই লিব ইদিক সিদিক
দু পায়েতে চলেই লিব ঠিক।

বিকাল বেলায় গিধনি ঢুকে
দেখছি পুলিশ বলছে মুখে,
বাইপাশে যা,বাইপাশে যা
...লে হালুয়া,কি খাবি খা।
দুগা ঠাকুর অনেক দুরে
যাতে হবেক সড়প ধরে।
হাঁটেই গেলম সবকে লিয়ে
রেল গেটটার উপর দিয়ে।

হাঁটা ত লয় লতুন জুতা পরে
যে বুঝবার বুঝেই গেছে চ্যারে।
সড়প ধারে লাইট দেখেই বলি
অ লুলুরমা এই ত ক্লাবের গলি।
হাঁটেই যাছি নাক বরাবর
হঠাৎ শুনি ঢ্যাং কড়াকর।
এগায় দেখি খেলাঘরে দুগা মাকে
হাত জড় করে দিলম পনাম ঠুকে।
সেলফি লিলম একটা গটা
চখে চশমা রংটা চটা।

তার পরে যাই পূর্বাশাতে
ঠেলেঠেলে ভীড় গলিতে।
খাবার দকান...তাকাই দেখি
রাজকচুরি,ঝিলাপি নাকি!
চিকেন পকড়া,চাওমিন,রোল
ঘুগনি,ফুচকা,তেঁতুলের ঝোল।
চলতে আর হয়নি জান খুড়া
ঠেলা হয়েই গেলম ঠাকুর গড়া।
দুগা ঠাকুর, দুগা ঠাকুর বল্যে
চরণ ধুলা মাথায় লিলম তুলে।

মাধবীলতা
নিসর্গ নির্যাস মাহাতো

মাধবীলতা সাদা পোশাকে এসে দাঁড়ায় কৃষ্ণচূড়ার নীচে

এমন সময় চলে যায় মরচে ধরা ট্রাম
গা ঘেঁষে বদমেজাজি ট্যাক্সি

বাড়তি সতর্ক আমি
হাত নেড়ে সরিয়ে দিতে চাই তাকে

ভুল ভাঙে,
অনেক সাবধানী মাধবীলতা

জানি না,
জীবনানন্দ বিভোর চোখে
এমনই কাউকে দেখেছিল কি না

ব্যস্ত মহানগরে সে এক স্নিগ্ধ- সম্মোহনী মুহূর্ত

মৃত্যুও বড় মায়াবী

রাস্তার ওপারে
খোলা চুলে মাধবীলতা দাঁড়ালে

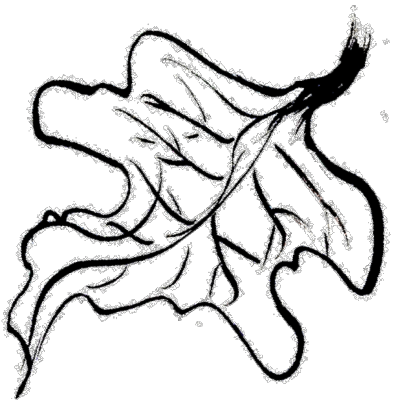

সু- নীল
রিম্পা ষড়ংগী

তুমি ত সুনীল,
তোমার আকাশ জুড়ে----
কাব্যগীতিতে পরিচিত প্রেম
গেয়েছ নিবিড় সুরে।।
তোমার কাব্য—
কাব্য ধারার গতি
শত পাঠকের বক্ষে তুলেছ
অনুভব সংহতি।।
বাস্তব বড়ো তোমার লেখণী
জীবন মন্ত্র বাণী
যুদ্ধের জিত,ঘাত প্রতিঘাত
স্বীকার করবে জ্ঞানী।।
তোমার নীরারা
কালস্বপ্নেতে আসে
তোমার বরুণা কথা ত রাখেনি
মিশেছে সর্বনাশে।।
যতদিন এই নতুন পৃথিবী
চলবে নিজের মতো
তোমার কাব্য পূর্ণতা পাবে
অন্তরে যথাযথ।।
নীল নির্জনে তোমার কবিতা,
পাঠক তৃপ্ত হয়।
গভীর যা কিছু সহজে বলেছ
এটাই তোমার জয়।।

দুগাপরব

শাশ্বতী হোসেন

হইলদা মাঠে, দুব্বা ঘাসে
লরম রোদে আশিন আসে
ফুইটছে শালুক একটঅ বছর পর
হা দেখ লো
ফুইটছে শালুক একটঅ বছর পর
কেনে নঅ , কেনে নঅ
মা দুগা আইসছে বাপের ঘর।

ডুংরিবাটে রোদটঅ ছুটে
জমিনগুলা তাতায় উঠে
কুলহি মুড়হায় গুঁদলু ধানের খড়
হা দেখ লো-
কুলহি মুড়হায় গুঁদলু ধানের খড়
কেনে নঅ , কেনে নঅ
মা দুগা আইসছে বাপের ঘর।

বাইক চাপ্যে শিব পেরাইল্য
মনটঅ কিমন শিরশিরাল্য
কার মাদলে জাইগল্য ডুলুং চর
হা শুন লো —
কার মাদলে জাইগল্য ডুলুং চর
কেনে নঅ, কেনে নঅ
মা দুগা আইসছে বাপের ঘর।

মাংস বিকে মুরলি ব্যাটা
গলায় তাবিজ মাথায় জটা
মনটঅ উয়ার চকচক্যা সুন্দর
অ বাপ রে —
মনটঅ উয়ার চকচক্যা সুন্দর
কেনে নঅ , কেনে নঅ
মা দুগা আইসছে বাপের ঘর।

করমকুইজা , মহুলসিজা
গাঁয়ে গাঁয়ে দুগা পুজা
বউ বিটিরা কইরছে মাকে গড়
দেখে যা —
বউ বিটিরা কইরছে মাকে গড়
কেনে নঅ , কেনে নঅ
মা দুগা আইসছে বাপের ঘর গ
মা দুগা আইসছে বাপের ঘর।

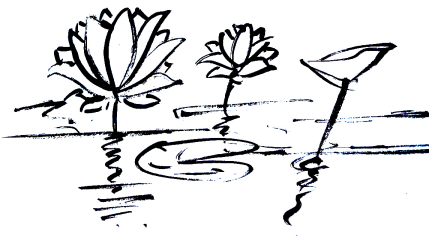

কথোপকথন বৃষ্টি ভেজা স্বপ্ন

ড . সোমনাথ দে

— তোর ওখানে বর্ষা এখন
মাঠ ঘাট ভরা জল
স্বপ্নে যদি আসি আমি
বৃষ্টি ভিজবি বল ?

— বৃষ্টি কি তোর একার মেয়ে ?
বৃষ্টি নামে উঠোন জুড়ে
মনের আঙ্গিনায় শুধুই তুই
খুঁজে দেখ অন্তঃপুরে।

— অন্তঃপুরের দরজা টি তুই
করিস না কভু বন্ধ
নইলে কিন্তু কাটবে তাল
মেঘ বৃষ্টির ছন্দ।

— মেঘ বৃষ্টিতে হলে দেখা
সোহাগ খুঁজি যদি
দুকূল ছাপিয়ে প্লাবণ এনে
পারবি হতে নদী ?

নদীর মত না পারলেও
আমার সবটা তোর তরে
তোর স্পর্শ পেয়েই থাকি
যখন আমি বেহুশ জ্বরে।

—জ্বরের ঘোরে যদি তুই
বাড়িয়ে দিস হাত
করবো নাকো কভু বারণ
তোকে ছোঁয়ার অজুহাত।

—অজুহাতের নেই তো কিছু
হবে দেখা আজ না হয় কাল
তুই আমার সঙ্গী হয়ে
থাকবি চিরকাল।

—চিরকাল থাকবি মেয়ে!
রাধাচূড়ায় তোকেই দেখেছি
সব ভুলেছি আমি যেদিন
তোর প্রেমেতে মজেছি।

নগ্ন ইতিহাস

পতিতপাবন মাহাত

মৃত্যুঞ্জয়ী যোদ্ধা যত মুক্তিকামী বীর
তেজ বুদ্ধি দুঃসাহস রণ নৈপুণ্যতা
শত কষ্টে অবিচল মানে না বশ্যতা
স্বরাজের অধিকারে বলি কত শির।

রুধির প্লাবিত বপু তবু শান্ত ধীর
নির্যাতন নিপীড়ণে অটুট মৌনতা
দৃঢ় বলিষ্ঠ প্রত্যয় লক্ষ্য স্বাধীনতা
শোষণ শাসন ক্লিষ্ট প্রতিজ্ঞায় স্থির।

আশ্রয়ে পাহাড় গুহা গোপন মন্ত্রণা
অর্ধাহার অনাহার দুঃসহ যন্ত্রণা।

দ্বীপান্তরে বন্দী শত নাই পরিত্রাণ
বীর জন্মদাত্রী ভূমি নয় ক্রীতদাস
ফাঁসি কাষ্ঠে নির্বিকারে দিল কত প্রাণ
রক্তস্নাত স্বাধীনতা নগ্ন ইতিহাস।।

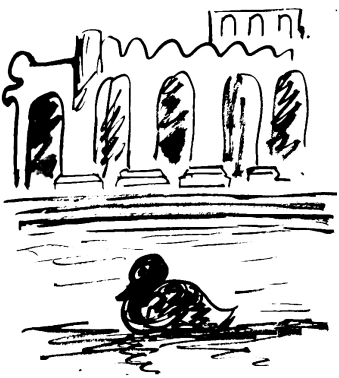

মন্থন

অনিমেষ সিংহ

বুকের মধুটা পান করো
জমিয়ে রেখো
রোজ পেটপুরে খাও

মধু, আমার বুকের-
দেখো- ইহাই অমৃত! অমর হতে চেয়েছিলে
যারা-
তারা সবাই ভালোবেসেছে

অন্য পথে গেলে-
মন্থন করতে হতো, সমুদ্রকে
তারজন্য, কতো শ্রমিকের প্রয়োজন, একটা বড়ো
মোটা সাপ
এবং বিষ পান করবে এমন, নেতা!

তার চেয়ে, ভালোবাসো

অমরত্ব পাবে

কাছের মানুষ অথবা অসমর্থিত সূত্র

দেবাশিস দণ্ড

কবি সুইসাইড করলেন।
যেন বেড সুইচটা নিভিয়ে দিলেন
অ-জাগরী ঘুমের জন্য।
বালিশের নিচে একটি সুইসাইড নোট পাওয়া গেল
সেও ছিল এক পঙক্তির কবিতা-
মৃত পৃথিবীর শোকে এ আমার অনন্ত নীরবতা...

শেষ পঙক্তিতে জীবনকে কাঁচকলা দেখিয়ে
মৃত্যুর সাথে সই পাতালেন —
আয় রে মরণ— গঙ্গাজল।

এরপর যা হয়-
ঘনিষ্ঠরা নড়েচড়ে বসল
পড়শীরা নড়েচড়ে বসল
প্রেম নড়েচড়ে বসল
প্রেস নড়েচড়ে বসল।

এরপর যা হয়-
ভালো মন্দ কথা উঠল
ভালোই উঠল বেশি
শোকের উৎসবে মন্দে ভারি মন্দা লাগে।

মৃত্যুর আগে কবি বকফুলের বড়া খেতে চেয়েছিলেন
কবিপত্নী জানালেন।

"আমি জানতাম পড়াশুনা করলে লাভই হয়
এখন শুনি লাভের পড়া ক্ষতির পড়া।
আমায় একটু বুঝিয়ে দিস তো খোকন।"
পুত্রকে এটাই শেষ কথা বলেছিলেন কবি।
কবিপুত্র জানালেন।

ঘনিষ্ঠরা সুইসাইডের সম্ভাব্য কারণ নিয়ে
সমাজমাধ্যম তোলপাড় করলেন।
কবির এক বান্ধবী ছিল না ?
চাপা সংকট... চাপান-উতোর... চোরা সংঘাত...
কিছুই অসম্ভব নয়।

এই বান্ধবীর কোনও কবিপরিচয় নেই
কবিতার মঞ্চ মহলে যাতায়াত নেই
তবু কেন তার কাছে বারবার ছুটে যেতেন ?
বৃত্তের বাইরে এত সাদামাটা এক রমণীকে
এত প্রশ্রয় কেন ?

প্রেস যখন নড়েচড়ে বসেছে
এবার একটা ফলাও সংবাদ হবে।
তদন্তসাপেক্ষ সংবাদের সমান্তরালে উঠে আসবে
হরেক কবিকথা।
কবিতার উৎসমুখ... প্রেরণা... বঞ্চনা...
কাব্যভাবনা... নানা বাঁক... যাপনচিত্র...
প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ...
অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি...
সম্মান... পুরস্কার...
সব খবর হবে পৃষ্ঠা জুড়ে।

কাছের মানুষ চাই—
কবিপত্নী কবিপুত্র

কবির অনুজ অগ্রজ আত্মীয় বন্ধু স্বজন...

প্রেস হতাশ হল
কাছের মানুষজনের কাছে কবির কোনও খবর নেই।
বকফুলের বড়া, লাভ-ক্ষতির পড়াশুনো
এবং একটা সাংসারিক জীবের সাদামাটা তথ্য।
সমাজস্বীকৃত কাছের মানুষের কাছে
কবিতার খবর নেই।

তবুও সংবাদ উঠে এল
এক অসমর্থিত সূত্র ধরে।

ভাগ্যিস কবির একজন বান্ধবী ছিল।

বৃষ্টিঋণ
ঋতশ্রী মান্না

পূর্বাভাসে ঝড়ের খবর,থমকে হাওয়া বারান্দায়,
অসুখ ছুঁলো জমাট ধুলো, বিরলে কার কান্না পায় ?

অন্ধ দুপুর,চাতকতৃষা,আকুল চাওয়ার বৃষ্টিজল,
সন্ধে এলো, মেঘ জমালো জানলাঘেঁষা মফস্বল।

কাহার জন্য কে পাঠালো নীলচে খামে বৃষ্টিমন!
অন্ধকারে আলোর চমক, চোখ পেতে কি অন্ধজন ?

গানের খাতায় মেঘ জমেছে,সুরের খেয়া কোথায় যায় ?
কার আঙুলে অলীক জোনাই, বিরলে কার কান্না পায় ?

গহীন খাতায় কে রেখে যায় মেঘলারঙা স্পর্শদাগ,
বিজন ঘরে জলের চিবুক সাজিয়ে তোলা অন্তরাগ।

জ্বরের কপাল,অনন্তকাল পেরিয়ে আসে বাদলদিন,
স্মৃতির কাছে আলগা মুঠো, হাতের পাতায় বৃষ্টিঋণ।

নৌকা ভাসে জলের পাশে, বৃষ্টি থামে কাচের গায়,
কার দোতারা একলা বাজে, বিরলে কার কান্না পায়।

আঁখির পানি
খগেন জানা

ছা , ছেনা মানুঁষ করার পাঁই
সবু গেলা বিল বাড়ী,
পানের বিড়ায় টাকা বাঁধি
পড়েই আঁনলি ডাক্তরী।
বুঢ়া বুঢ়ি রহিবা সুখে
পো ঝনেঁ বড় রোজগারী,
খুজি খুজি বাহা করেই
বৌর সরকারী চাকরী।
দিন কাতে কাটার পরে
কপাল পুড়ি ছারকার,
পো রহিলা বহরমপুরে
বৌমা ডায়মন্ডহারবার।
বুঢ়া বুঢ়ি রহিলি,দেশের ঘরে
আশায় মরলি চাষা,
পো বৌর হাতে শাশু দিলা
শেষ সম্বল বুঢ়ীর কানপাশা।
লুয়া বৌ আইসি গেলা ঘুরি
পো কে চাঁহি , আঁখিয়ে ছানি,
বিল বাড়ী গেলা মানুঁষ করায়
নোহ পুছি আঁখির পানিঁ।

পুষ্প পিতা
খুকু ভূঞ্যা

ঘাম ঝরিয়ে যে বাগান সাজায় তুমি বলো মালী
আমি বলি ফুলের বাবা
মাটিকে উর্বর করে যে হাত, তার প্রাণ কত ভেজা নরম স্নিগ্ধ
সুগন্ধি মিলন ঘটে শ্রমে ঘামে

যে মাটির যৌবনে হাত রেখে পুঁতে দেয় বীজ
প্রাচীন কোনো সভ্যতা চুরমার করে
যেমন নতুন আসে বর্ণে গন্ধে আলো কূজনে
তেমনি তার স্বতন্ত্র পৌরুষ চমকায় বীজের বেড়ে ওঠার সঙ্গে

তুমি যতই বলো মালী তার নাম
আমি বলব, ফুলের বাবা দাঁড়িয়ে আছে
জননী মাটির কাছে, উদার আকাশ

মায়ের মুখ
মৌপর্ণা মুখোপাধ্যায়

এক শরৎ গন্ধের মেঘ
পরিচলন স্রোত ছুঁয়ে
নেমে আসে মাটির হৃদয়ে।
সোনার বরণ রূপ; কাঠামোতে আসে প্রাণ।
মঙ্গলশঙ্খ, উলুধ্বনি
স্নান সারে নবপত্রিকা।
ঘটের উপচে পড়া জল
ছুঁয়ে থাকে আম্র পল্লব।
বার্ধক্যের কাঁপা কাঁপা দুটি হাত,
জানালার মরচে পড়া রড ধরে
চেয়ে থাকে অপলক।
এক মায়ের চোখ দেখতে চায় আরেক মায়ের মুখ।

অহৈতুকী

শ্রীতনু চৌধুরী

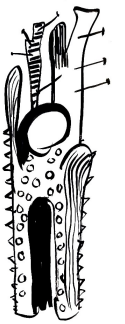

অ-ফসল অনাঘ্রাত প্রদোষ সফর
স্বাভিমান ডুবে যায় শিলাবতী পার
কুশের আঁধার নামে ঝুপঝুপ রাত
কোথাও পাইনি খুঁজে বাসা সমাচার
হাতে হাত চলে দুই বুভুক্ষিত বুক
ভালা মুখ পিছে ডাকে কাঞ্চন প্রলাপ

এখন কি ফেরা যায় আর
তারা তো নাভীর বনে এই
পেয়ে গেছে কস্তুরি সুবাস

উপবাস স্তব গৃহ আগুন মর্মর
যুগল আহুতিদান তীব্র পরস্পর
দিতে হবে দানপত্র সৃষ্টিত সম্মতি
শিখাশীর্ষে সরস্বতী নাভী পদ্মাবতী
হোমকুণ্ডে জ্ঞান জন্ম বাসনার ছাই
ধোঁয়াতে কলঙ্ক শুধু কালি চিরকাল
তা যেন লাগে না গা'য় তাইতো গোঁসাই
অতলে তলিয়ে আনে রতন প্রবাল
আমি তো স্বরূপ জানি গোপন প্রকৃতি
চাই না নিমিত্ত হও তুমি তরুবতী
সমান সঙ্গতে রাধে দেখাও দৈবকী
ভুল নয়, এ পূজায় তুমি অহৈতুকী।

সুতো

রাজা ভট্টাচার্য

সুতো জমানোর সখ ছিল বাবার
লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, কালো অনেক রঙের
আর সেই সব সুতো বাবা নিজের গায়ে গুটিয়ে রাখত যত্ন করে
আমি আর ভাই অবাক হয়ে দেখতাম সুতোগুলোও বাবাকে
আঁকড়ে থাকতো ভালবেসে

বাবা আমাদের সেই সব সুতো সংগ্রহের আশ্চর্য গল্প বলতো...
শুনতে শুনতে আমারও সুতো হয়ে যেতে মন করত
বাবার গায়ে জড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করত
সুতো গুলোর থেকে বাবার গন্ধ পেতাম

বাবা যেদিন মারা যায় শরীর থেকে সব সুতো খুলে পড়ে গিয়েছিল
আর সেই সুতো দিয়ে মা তৈরি করেছিল এক আশ্চর্য জামা
যা দিয়ে ঢেকে গেছিল আমাদেরর ফুটো হয়ে যাওয়া সংসার
এখন আমি সুতো জমাই
আর একটা আশ্চর্য জামা তৈরির আশায়...

জলরং ছবি ও কবিতা

ড. শান্তনু ভৌমিক

১.

রাধা চূড়া কৃষ্ণ চূড়া
সবুজ গাছের চূড়া।
খুড়ির জন্যে মাটির হাঁড়ি
যাচ্ছে নিয়ে খুড়া।

হন হন হন যাচ্ছে খুড়া
যাচ্ছে দু পা ফেলে।
হরেক রকম রঙিন পাতা
দেখছে দুচোখ মেলে।।

রাস্তা মাটির হাঁড়ি মাটির
লেপা বাড়ির মাটি।
সারা জীবন ধরে ওরাই
ষোলো আনা খাঁটি।।

২.

শুকনো কাঠে দুহাত ভরা বস্তা ভরা পাতায়
সন্ধে হলে যাবে চ'লে বস্তা নিয়ে মাথায়।

লাল শাড়ীতে ওগো দিদি কোথায় তোমার ঘর ?
একলা গভীর জঙ্গলেতে নেই কি তোমার ডর ?

জঙ্গলেতেই বসত বাড়ি মাটি মোদের প্রাণ
সেই মাটিতেই ম'নের সুখে আমরা করি গান।

শহর কুলের বাবু তোরা তোদের অনেক টাকা
সারা জীবন তোদের সবই মিথ্যে দিয়ে ঢাকা।।

দেখলে হবে

মন্দাক্রান্তা সেন

এই তো আমার প্রাত্যহিকের কড়চা

পাঁচটাতে ভোর, তোমায় ভেবে
নটায় অফিস তোমায় ভেবে

বসের ধমক, তোমায় ভেবে
কলিগ-খেজুর, তোমায় ভেবে

সাতটাতে ঘর, তোমায় ভেবে
দশটায় খাই তোমায় ভেবে

সারাক্ষণই তোমায় ভাবার চর্চা

বললে হবে ?
সাউথ সিটির খরচা ?

ফিরব বললে ফেরা যায় না

সোনালী ঘোষ

ফেরার কথা উঠলেই ভুলে যাই জন্মশোক।
মাটি জানে গোধূলির রও সোনা।
সে এক আশ্চর্য গ্রহ...
যদিও এসব বিষয় আমার নয়।
আগাছা স্বপ্ন ত।
আমি মোরগ ডাকি।বলি, গলা ফুলিয়ে ডেকে ওঠ...
এ শরীর নিশি পেলে সারা উঠোন জুড়ে ছায়া হাঁটে।
শিরশিরে ধুলোমাখা পা দুখানি তার।
এগাছ থেকে ওগাছ হাওয়া বয় ...মহুয়ার গন্ধা দুলে ওঠে।
অষ্টাদশী তখন বসেছে শৃঙ্গারে, ঠোঁটে তার আজ যৌনপিশাটা।
ছিড়ে খায় হৃদপিণ্ড ফুসফুস বুভুক্ষ যেন...
আমি ও এ যাবৎ কাল তার প্রতিবেশী হয়ে আছি।

মুখর বাদল দিনে

আশিস মিশ্র

বিকেলে ভাবছ বৃষ্টি, বিকেলে রেস্তরাঁ
বন্ধুরা ভিজেছে মনে দূরত্বে মদিরা।
পান করো ঝর ঝর আনন্দ-রজনী
বাইরে তুমুল কিছু ভিতরে সজনী।
কীভাবে ধরবে তাকে বাদল পুরুষ
বৃষ্টি কি ফরাসী মেয়ে ? ভারতীয় ? রুশ ?
কে বলেছে কে বলেছে সে তো ঝাড়গ্রামী
অথবা সে চন্দ্রমুখী; রাধাগ্রামে থামি
বসিল কবির ঘরে ভেজা কেশরাশি -
এইবার রবিগানে তার কাছে আসি।
এই তো চেয়েছো তুমি প্রান্তিক-জীবন
তার মাঝে ডুবে থাকে ভার্চুয়াল মন।
জানো তুমি তার দেশ তার কাল-কাব্য
সে তো ভিজিয়ে দেয়, চিরন্তন শ্রাব্য।

উদয় শঙ্কর রক্ষিতের অনুকবিতা

সুঁই

আজ অবধি এমন প্রেমিক-সুতো পেলামনা যে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে শরীর মন।

কলহ

খবরদার! কালাচাঁদ, ত্রিসীমানায় যেন
না শুনি ও বাঁশির সুর,
খরা-পোড়া তরকারি গিলতে হয় রোজ রোজ।

চাকা

গড়াতে গড়াতে কি যে আছে ভাগ্যে !

সুখ

সুখ অলীক কল্পনা মাত্র,
স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার ঘরে যেন একটি জোনাকির আনাগোনা।

জিজিবিশা

পুরোটাই আজও অজ্ঞাত।
চক্রব্যূহে ধূর্তগুলো কি জানতে চেয়েছিল অভিমন্যুর শেষ ইচ্ছা কী ?

শান্ত হও

প্রসাদ সিং

ঝড়ের সময়েই শান্ত থাকতে হয়
পাহাড় হতে হয়
হতে হয় গাছ
নিদেনপক্ষে নদীও হতে হয়

নইলে ঝড়ের শেষে
পরিতৃপ্তির আকাশ নিয়ে
উদিত হবে না
রামধনু

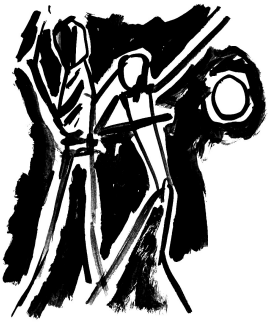

হুলের গান

বিনোদ মন্ডল

শুধু তোমার জন্য একটি গান
রাতচরা
বুকে তোমার বুলেটশোভিত ইস্তেহার
মানবো না !

তোমার জন্য হে বীর সিধু কথাটা বড়ো
একপেশে
পাশে ছিলো দশটি হাজার বীর সেনানী
রায়বেঁশে !

ভূমিপুত্রের সঙ্গে হাঁটা— মুচি, হাড়ি, নাপিত, ডোম
হুঁশিয়ার হো !
শিশির ভেজা পাতায় মেশা অশ্রু ঘাম
দামিন - হি - কো !

ইতিহাস যা শিশুপাঠ্য নাই বা লিখুক
মুক্তি ব্যাকুল
স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ— বার্তাবহ
প্রাণের হুল!

অবচেতনে

সুদীপ্তা মাহাত

নিঃশ্বাসে বিষ, বিষাক্ত পৃথিবী।
হে মানব! এ বড় দুঃসময়!
তুমি জানোনা প্রিয়,
যে কৃষ্ণচূড়ার ফুলে আমার উঠোন
রাঙা হয়ে উঠতো;
আমি গাইতুম ,তুমি শুনতে;
আমি হাসলে ,তুমি বলতে -
সেই উঠোনে আজ মৃত্যুশোক।
যে বাগানটি আমরা বানিয়েছিলাম পরম যত্নে,
তার গন্ধ আর নেশা লাগায় না।
যে মাটির বুকে পা রেখে আকাশ ফুঁড়ে উর্দ্ধে ওঠার স্পর্ধা রেখেছিলাম ,
সে মাটি আজ পঙ্কিল।

তুমি জানোনা প্রিয়,
যে পাখিটা রোজ ঘুম ভাঙাত কাকভোরে মিষ্টিসুরে,
সে আজ জীবন্ত লাশ; দুর্ঘটনায় কাটা গেছে তার ডানা,
মনে মনে সে মৃত্যু পুষেছে;এ অক্ষমতা লজ্জার।

জানো প্রিয়,
আমিও ঠিকানা বদলে নেব,চলে যাবো অনেক দূরে -
যেখানে রয়েছে সুস্থ পৃথিবীর হাতছানি।
হে মানব! এ বড়ো দুঃসময়!
নিঃশ্বাসে বিষ,বিষাক্ত পৃথিবী।

আহ্বান

সাগর মাহাত

চোখ বন্ধ রাখলে সমূহ বিপদ
ধ্যানস্থ হলেই অন্ধকারময় পৃথিবী
আর অন্ধকার থেকেই জন্ম নেয় অহংকার
আমরা ভুলেই যায় এই মাটিও একদিন নির্বাসন দেবে।

চোখ খোলা রেখে বরং এসো এ পৃথিবী ভ্রমণ করি
মানুষের জনসমুদ্রে মিশে যায়
সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে
পৃথিবীর এক সুন্দর চিত্রকল্প গড়ে তুলি।

রাত্রির ভিতরে এসে যদি আরো...

জয়ন্ত দাস

রাত্রির ভিতরে এসে যদি আরো
রাত্রি পাই, যদি গাঢ় শূন্যতা জেগে
উঠে অশেষ, তবে নিজেকে নিজের ভিতরে
খুঁজি, আর বলি, এই ভালো, এই অনিশ্চয়,
অতীত বিন্দু এসে ভবিষ্যৎ জলে মিশে যায় !

এমনিই হয়তবা, অদৃশ্য লিখন থাকে লেখা,
অন্ধকারে জেগে উঠে গাঢ় অন্ধকার,
হারিয়ে যায় দিনগুলি, রাত্রিগুলি জমাট,
শুধু পড়ে থাকে নিবিড় জন্মভূমি,
দ্বন্দ্বময় শব্দ, ধ্বনি,-তার যন্ত্রনা, বিষাদ !

সেই বিষাদ, সেই ভাষ, শিরোনামে তুমি,
নিয়ত মৃত্যু এসে ভরে দেয় চোখ,
এখনো বেঁচে আছি তবু, এতোই পাথর আমি,
কিছুই বুঝিনি এখনো-কালোত্তীর্ণ কাল,
রক্ত ও ধমনীতে প্রবাহ,জ্বালা, দাহ -কল্লোল !

গোপন ইচ্ছে

দেবব্রত দত্ত

আজকে যখন হাত পেতেছি তোমার কাছে,
বলতে পারো . . .
মনের মধ্যে গোপন কিছু ইচ্ছে আছে
সেদিন যখন নদীর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম
শুকনো নদীর দুঃখ কিছু দেখেছিলাম
মরা নদীর শুকনো বালি জমাট বাঁধা
তার ভেতরেই বাঁধা ছিল চাঁদের ধাঁধা
স্রোত ছিল না তখন তাকে ধুইয়ে যে দেয় . . .
বুকের জমাট দুঃখ কিছু বইয়ে যে দেয়!
এবার দেখো ঝড় উঠবে উড়বে বালি
তখন তোমার বুকটা যদি হয়বা খালি; --
আলিঙ্গনে আটকাবে কি আমার হৃদয়
কথা দিলাম সরিয়ে দেবো জয়-পরাজয়
আরেকটি বার অভিমানের পাহাড় সরাও
নোনা জলে দেখবে তখন সবটা উধাও
নদী হয়ে দেবো না আর থাকতে তোমায়
বুকের মাঝে মিলিয়ে নেবো এই মোহনায়।

না

মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী

একদিন ভেবেছিলাম-
ঐ যে দূরে
রাস্তার উপরে
সোনালী ধান আর সবুজের আলাপনে,
আকাশে নীল সাদা ভেলায় চড়ে
উড়ে যাব দূরে, বহুদূরে-
পাঁজি দেখে, কাঙ্খিত দিন ধরে প্রস্তুতও হলাম,
ভোরে উঠে দেখি-সূর্য্য ওঠেনি
পাখিও ডাকেনি,
কয়েকটা ষাঁড় ছুটে চলেগেল মন্দিরের পাশটায়।
বাড়ি থেকে বেরোতেই একটি কাক মাথাতে আঁচড়ে এসেও উড়ে গেল-
শকুন গুলো মহানন্দে আকাশে গোল করে দাগ দিচ্ছে -
রাস্তায় পৌঁছে দেখি শয়ে শয়ে লাশ আছে শুয়ে।
সবার হাতেই লাঠি
গলায় গামছা
পরনে সাদা ভেজা কাপড়।

খানিক বাদে মেয়েটা এসে কাঁদে অঝোরে-
বাবা আজ মেলা বসেনি।

ভালো শেষে ভালো সব

প্রবীর কুমার দত্ত

কার বুকে কত ব্যথা- হৃৎ স্পন্দন কি জানে,
জমি জানে শত কথা পৃথিবীর মানে।

যার চোখে জল নেই শুকনো সে মহীরুহ
জলাভাবে মরে লতা পাতা পোড়া এক গৃহ।

যার চোখে আলো নেই নিরর্থ রোশনাই দীপাবলি,
ঘুমহীন রাত্রি জানে রাতজাগা পাখির কথাকলি।

উড়ন্ত মেঘ আনে মাটি ভেজা বৃষ্টির খবর,
রামধনু দেখে মনে সেকি আনন্দের লহর।

যার বুক জানে না সে হাড়ে হাড়ে মজ্জা,
কি আছে কি নেই তাই কি শেষের সজ্জা!

ভালো থেকে ভালো করা কার কিবা ভয়,
ভালো শেষে ভালো সব জয় হয় নিশ্চয়।

যাত্রামোদী বুধার বাপ

নীলেন্দু মাহাত

সরস্বতী পুজোয় যাত্রা হবে
নবারুণ সংঘের মাঠে,
ব্যস্ত ভীষণ বুধার বাপ
নেইকো সময় হাতে।
সন্ধ্যা হলেই রিহার্সালে
লণ্ঠন হাতে চলে,
ধ্যান জ্ঞান সব যাত্রার রোলে
কাজকম্ম খানা ভুলে।
যাত্রা তার রক্তে মিশে
এমনি ভারি নেশা,
মুখ বুজে তায় গিন্নীর গালি
সয়ছে হামেশা।
গিন্নীরে কয় বুধার বাপ
যতোই বকো আজেবাজে,
সেইদিন নাচবে মোরে নিয়ে
দেখবে যখন মঞ্চে রাজার সাজে।

হাজির হলো সেই সন্ধিক্ষণ
সাড়ম্বরে শুরু যাত্রাপালা,
লোক গিজগিজ জনারণ্য
জমজমাটি মেলা।
দর্শকাসনে করতালির ঝড়

শিল্পীবৃন্দের অভিনয় খাসা,
মনোমুগ্ধকর যাত্রাপালা
"লালগড়ের লাল বাদশা"।

রাজা এলো মন্ত্রী এলো
মঞ্চে এলো সেনাপতি,
বুধার মা হয় বিচলিত
উঠবে কখন পতি ?
পতির দর্শন না পেয়ে শেষে
গ্রীনরুমের পিছে যায় চুপিসারে,
সেথায় বসে বুধার বাপ
ধুচ্ছে চা-কাপ যতন করে।

সাঙ্গ হলে যাত্রাপালা
ঘর আসিলে পরে,
বুধার মা ঠাণ্ডা গলায়
সুধায় পতি রে,
রাজার রোল করেছিলো যেজন
দক্ষ ছিলো সেজন অভিনয়ে,
আমি ই ছিলাম রাজার ভূমিকায়
বুধার বাপ কহেন সবিনয়ে।
মন্ত্রীর ভূমিকায় যেজন ছিলো
করেছে সে সবার মন জয়,
সেই রোলটিও আমার ই ছিলো
হয়েছো খুশি তুমি নিশ্চয়।
হাটে হাঁড়ি ভেঙে বুধার মা কহে,
বলোতো মোরে বলোতো সুজন,
গ্রীনরুমে তে একমনে বসে
চা-কাপ ধোওয়ার রোল
করছিলো কোন জন ?
লাফিয়ে উঠে ধমক মেরে
বুধার বাপ কহে,চোপ শালী!
খেতে দিবি চল্ এখন,
পেটের ভিতর সেই কখন থেকে
হয়েছে শুরু ছুঁচো র কেত্তন।

রাতের তারা-রা

সৌমেন মন্ডল

রাতের আকাশে সব তারারা ঘুমিয়ে গেলেও
একটি তারা জেগে থাকে
মনের খেয়ালে তার প্রিয় তারার ছবি আঁকে।
তারারাও স্বপ্ন দেখে পাশাপাশি থাকার
মিট মিট করে ভালোবাসার...
কিন্তু আবার কেউ কেউ তারাখসার মতোই ঝরে
পড়ে আকাশ থেকে..
আকাশ তার হিসেব রাখে না...
শুধু মনে রাখে
কোন তারা নিজেকে জ্বালিয়ে আলোকিত
করেছিল তাকে...
ভালোবেসেছিল আকাশকে।

স্বাধীনতা মানে

পুরন্দর ভৌমিক

স্বাধীনতা মানে এক নতুন শিশির ভোর,
স্বাধীনতা মানে সকলের সাথে আত্মীয়তার ডোর !

স্বাধীনতা মানে নিজের নিজেকে দেখা,
স্বাধীনতা মানে তোমার-আমার কথা !

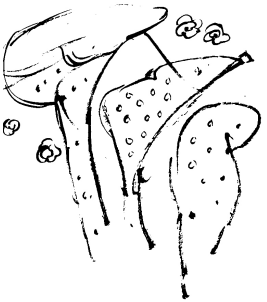

রক্তের দাগ মুছে ফেলে ; শান্তির বিপ্লব স্বাধীনতা ,
বিপন্ন আত্মা ঘর খুঁজে ; ঘর পেলে হয় স্বাধীনতা !

পেট ভরা দু'মুঠো ভাতের নাম স্বাধীনতা ,
ফালি চাঁদে হাসি মুখ খোঁজে স্বাধীনতা !

স্বাধীনতা মানে অন্যায়ে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ,
স্বাধীনতা মানে ভালোমন্দ ; ন্যায়-অন্যায় বোধ !

ফুটপাথ ঘেঁষে বসা ক্ষুধার্ত উলঙ্গ শিশুটা স্বাধীনতা ,
ডাস্টবিন থেকে উত্থিত ক্ষতবিক্ষত হাতটাই স্বাধীনতা !

স্বাধীনতা মানে একটা সূর্য ভীষণ অন্ধকারেও ,
স্বাধীনতা মানে নব সামগান মহাসমুদ্র ওপারেও !

স্বাধীনতা মানে উত্থিত মুঠো - নিঃশেষ পথচলা ,
স্বাধীনতা মানে একক মুখে হাজার মুখের মেলা !

মাঝে মাঝে কেন

সীমা সোম বিশ্বাস

মাঝে মাঝে কেন
ভুলে যাও তুমি ?
বুঝিনা তো আমি !
সেকি আমারই কোন অপরাধে
নাকি তোমার কোন
অভিমানে অনুরাগে ?

তোমার ভুলে যাওয়া আমাকে ভীষণ একলা করে
সেকি তুমি জানো না ?
আমি তখন ভুলি
আমার সব কিছুকে ।
আমি তখন থাকি নিঃশব্দে
অশ্রু মাখা আঁখিতে !

দিগন্তরেখা

মুকুন্দ কর

তারপর দিনের আলোর সাথে ধীরে ধীরে
মুছে যায় অপ্রকাশিত অভিমান।
আলপথের ধারে ফোটা নাম না জানা ফুলেরাও
দিনকতক পরে ঝরে যায় নতুবা তাদের
মাড়িয়ে দেওয়া হয়;
বিশাল পৃথিবীর খবর তাদের কাছে পৌঁছয় না।
দূরে বীথিকার মাঝে ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে
রহস্যের বাতাবরণ।

যে পাখি বাসা ছেড়ে চলে গেছে
তার খবর কেউ রাখেনি।
দমকা হাওয়ায় আলগোছা বাসাটা থেকে
শুকনো খড়গুলো খুলে খুলে উড়ে যায়,
উড়ে যায় খসে পড়া পালক।
যে সংসার গোপনে গড়ে উঠে গোপনে
ভেঙে গেছে— ইতিহাসের পাতায় তা
কোনো দাগ কাটেনি।

এখন

ভিক্টর মাহাত

এখন দেখি একলা আকাশ বাতাসে বিষাদ ব্যাথা
তৃষ্ণা কাতর কাব্য ভাষা অনর্থ মুগ্ধতা।

এখন দেখি একলা আকাশ মাধুর্যেরা মেঘলা
দুর্বিপাকের ঘূর্ণচক্রে আপত্তিকর ভেলা।

ধুয়ে নিয়ে গেছে বৃষ্টির ফোঁটা অনুভূতিটুকু বিদ্যমান
পুরানো কখন নতজানু হয় গভীর রাত্রে করায় স্নান।

জীবন গাড়ীতে কান্না বোঝাই নিদ্রা গেছে উড়ে
তবুও তুমি চাঁদ আলো হয়ে রয়েছ হৃদয় জুড়ে।

এখন দেখি একলা আকাশ পুড়ছে অন্ধকার
বোধের আলোয় শোকের জন্ম চূড়ান্ত হাহাকার।

যুদ্ধের পর
রাজেশ মাহাত

আমি দেখিনি যুদ্ধের পর মুখের উপর হাসি
আমি দেখিছি সেই মুখেতে রক্ত ভরা তল্লাসি।
আমি দেখিনি সেই রাতে তারাদের সমাগম
আমি দেখিছি শুধু সেই রাতে একলা থাকার ভয়।
আমি দেখিনি হিংসে ভরা উত্তাল যত কাজ
আমি দেখিছি বাবুদের আগুনে, পড়া মানুষের ছাই।
আমি দেখিনি যুদ্ধের পর এই প্রকৃতির ডাক
আমি দেখিছি শুধু আগলে ধরা ওই প্রকৃতির সবুজ ভরা কাঁধ।
তোমরা যখন অত্যাচারি বারুদ আর বোমাতে
আমি দেখেছি তখন চোখের কোণে ভালোবাার ছোয়াকে।
একটা যুদ্ধ থামার পর আর একটা যুদ্ধ ওঠে
খানিকটা কারো বুকের ভিতর, খানিকটা কারো পেটে।
দেখবো সেদিন যুদ্ধের পর কেমন করে তুমি হাসো
যখন পড়ে থাকবে শুধু ছাই, আকাশ ঘেরা চিল আর মানুষের হাহাকার।
আমি দেখিনি এই জগতের মানুষগুলোতে একি
আমি দেখেছি শুধু চোখ রাঙানি বিরুদ্ধের ছদ্মবেশি।

ভারতবর্ষ
প্রসাদ মল্লিক

অস্তিত্বের সামনে প্রশ্ন রাখতে পারিনা আর,
আমার বোধের কুঁড়েঘরে আগুন লাগায় ঘুম।
ধোঁয়া ওঠে, ক্লান্ত দুচোখ ডুব দেয় পশ্চিমে —
ওহ! অন্ধকার, তুমি কি স্বচ্ছ হতে পারোনা ?

মাঠজোড়া শুকনো ধানশীষ, খরার আর্তনাদ, মুর্শিদের সুর —
মিশে যাচ্ছে ঘামের তীব্র গন্ধে,
তোমার প্রেমের প্রতিটা ছোঁয়াতে মুখ মোছে এ-রাষ্ট্রের ভালোবাসা!

তুমি মাটির কাছে যাও,
তাতে জীবন নেই, নেই কোনও প্রেম,
যেটুকু পড়ে আছে— সমূহ মৃত্যুর বিবর্ণ স্তূপ,
নোনা-রক্তে ভেজা জাতীয় পতাকা আর সংবিধান!

অন্তর

চয়ন রায়

১
অন্তরে প্রদীপের আলো
আলো ফেরে, আলোপাথর
হৃদয়ে পূর্বপুরুষের দুটি পা রয়ে গ্যাছে অবিকল
কালের চিহ্ন এবং
রোদ-ঝড়-জল
জলাভূমির পাড় বেয়ে বেয়ে তেপান্তর

২
অন্তরে প্রাচীণ সন্তাপ
প্রেম, নিটোল প্রেম
নারী ও পুরুষ বন্দির জন্য আলাদা আলাদা খোপ
পার হয়ে যাও
লৌহ গরাদ
আলোগুলি এখনও নেভেনি

৩
অন্তরে হু হু হু শব্দ
সমুদ্রের পাশে স্বর্গদ্বার
বুক দিয়ে গমন করেন সর্বত্যাগী।
দুরন্ত অশ্বের পা
বালি উড়িয়ে বুজিয়ে দেবে
তিন ভাগ জল

৪
অন্তরে বহমান রোগক্লিষ্ট সুর
আহত বিষণ্ণ আকাশ
লক্ষ কোটি হৃদয়, আত্মীয় স্বজন
বিস্মৃত অন্য প্রেম
নিঃশব্দ ক্ষরণ নয় নহে
নহে অপঘাতে মৃত্যু

৫
অন্তরে নীল প্রবাহ
নীল নীলনদ
পংক্তিতে শত সহস্র পা
গভীরে স্যাঁতস্যাঁতে গলি
রাত্রি এসে যায়।
রাত্রি এসে যায় উপত্যকায়

৬
অন্তরে ধূ ধূ দুঃস্বপ্ন
স্বপ্নে স্বপ্নে বিরোধ
শ্বাসরুদ্ধ হত্যার কাহিনী, নৃশংসতা
শোবার জায়গা প্রস্তুত
নিয়ন আলোয়
আলোকজ্জ্বল দূর অতীত

৭
অন্তরে সীমাতীত শূন্যতায়
ঝাপসা মাঠঘাট
পাতলা ইট, ইটের পাঁজরে পাকানো শেকড়
পিচুটি ও পচাবস্তা
সাবধানী চোখ
এবং শিহরিত জীবন সঞ্চার

লবা

রাজুরানা দাস

ভুর সকালে দু'টো জলে ভিজাই মুড়ি
ঢক্ ঢকাই এক পেট জল গিলে, লবা উবাক হয়ে ত্যাকাইন দ্যাখে
চিইৎকার কইরে বইলতে থাকে
বাপহে আরে ও বাপ ত্যু কুথায় গেলিরে বাপ।
হোই দ্যাখ বাবুদের কুকুর টোকে,
কত কি খ্যাতে দিছে,
আরমুই শুখা মুড়ি জলে
চিতল পাড়ার গবরু বাগদি ছিল্যাটোর
মুখ চাপি ধরি বইলতে থাকে
চুপ বেটা চুপ,অরহা বাবু আছে,
হামদের দেবতা আছে !
লবা উবাক হয়ে বইলতে থাকে
কিরে বাপ ত্যু মিছা কথা বইলছিস
মুদের দেবতা তো মাড়াং বুড়ু
অরহা কেনে।
গবরু বাগদি বইলঅ লবা লবা হে
অরহা হামাদের মনিব আছে
অরহাদের খেতে খামারে কাজ করি
পেটের খুরাকী চাল্যাতে হয়।
লবা বলে তো বাপ ইটা কেনে হয়,
ত্যু মনিব কে পুজা দেনো বাপ
মুই পূজা দিবো শাঁখ বাজাই।
গবরু বাগদি কঁকাই কঁকাই কাইনদে কাইনদে
ছবিটো কে বুকে জড়াই ধরি
বইলতে থাকে লবারে লবা
ত্যু চলি গেলি বাপ,ত্যু চলি গেলি,
উ সালা বাবুরা ঢ্যমনা জোঁকের জাত
তলে তলে হামদের চুষে খাছে,
মোর গতর আছে,
টাঙ্গি দিয়ে কুপাই কুপাই মাইরবঅ
উদের সব ছিনাই লিব,
ত্যু চলি আই বাপ ত্যু চলি আই
লবাহে আরে ও লবা
ত্যু চলি আয় ত্যু চলি আয়
ত্যু ফিরি আয়।।

আঙুলে বর্ণমালার মিছিল

কমলেশ নন্দ

বর্ণমালায় আঙুল বুলোতে বুলোতে
একদিন আমিও তোমার মতো
দিদুনের মতো
মা হয়ে গেছি।

আমিও দেখছি—
কীভাবে দু-আঙুলের ফাঁকে পেন্সিলেরা শব্দ ছড়াতে ছড়াতে
মেপে দেখছে জীবনের আকার আয়তন।

মাগো, বর্ণমালায় তাকিয়ে থাকে
ঝাপসা চোখ দুটো।
মেয়ে আর লিখতে পারে না—
বলতে পারে না—
বোঝেও কী!

মা দিদুনকে বলে দিও
মা হয়েছি কিন্তু মাতৃভাষা ভুলেছি।

মানুষ আসলে...

সৌমেন শেখর

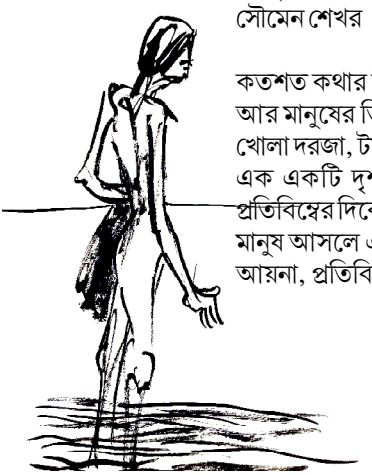

কতশত কথার ভিতর থেকে যায় মানুষ
আর মানুষের ভিতর থেকে যাওয়া কতশত কথা
খোলা দরজা, টানা চৌকাঠ থেকে -
এক একটি দৃশ্য ফিরে যায় তার নিজস্ব আয়নার দিকে,
প্রতিবিম্বের দিকে
মানুষ আসলে এক স্মৃতি-অন্ধ প্রানী
আয়না, প্রতিবিম্ব আর চৌকাঠের ধূসরে, স্থির বেজে যায়।

গল্প

প্রবন্ধ

ও

নাটক

পক্ষান্তর

শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

— "দেখ, দেখে শেখ, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ কাকে বলে। সৌমাল্যর পা ধোয়া জল খেয়ে আয়। ছেলেটা ওর বজ্জাত বাপ নির্মলের বিরুদ্ধে গিয়ে আমার পাশে দাঁড়াল! নইলে শুধু আমি একা ফাঁসতাম। নির্মলই যে নাটের গুরু সেটা গোপন থাকত।"
— "আমিও তো যা সত্যি, তাই তো বলেছি বাবা।"
— "ঘরশত্রু বিভীষণ কোথাকার! বিরাট আমার ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির এসেছিস – পুলিসের কাছে নিজের বাপের এগেইনস্টে স্টেটমেন্ট দিয়ে সব ফাঁস করে দিলি ?"

❁ – ❁ – ❁

ভালোবাসার জিনিস

দেবাশিস দে

রমাপদ অনেকটা পথ হেঁটে ক্লান্ত, কল দেখে তৃষ্ণা মেটানোর চেষ্টা করে। পাশে বিশাল এক নালায় বয়ে যাচ্ছে গ্রামের দূষিত পরিত্যক্ত জল। কলে জল খেতে খেতে রমাপদ পাশের নালায় ভারী কিছু পড়ার শব্দ শুনতে পায়। সামনে তাকিয়ে দেখে একটি পুরুষ আর এক মহিলা দৌড়ে পালাচ্ছে। রমাপদ'র কৌতূহল বাড়ে। সামনে এগিয়ে যায়, দেখে বিশাল একটা কাপড়ের পুঁটলি জলে পড়ে, কিন্তু পুঁটলিটি মাঝে মাঝে নড়ে উঠছে।রমাপদ নালার জলে লাফ দেয়।

❁ – ❁ – ❁

প্রেম প্রেম

সুমন রায়

তোমাকে দেখতে চেয়ে একবার চিঠির জবাব পাইনি বলে সারাদিন পায়ে পায়ে বর্ষার তীক্ষ্ণ ফলার মতো আগুন কাঁটার পথ পেরিয়ে এলাম। লাইটপোস্টের একেবারে শীর্ষভাগের তেরছা আলোয় সিঁদুরে মুখ বজ্রকঠিন জিজ্ঞাসা নিয়ে দাঁড়িয়ে। কে প্রগলভ হয়ে প্রাণোচ্ছলতায় অবগাহন করবে, সে চ্যালেঞ্জ বনের আর পাঁচটা ঝরে পড়া জীর্ণ,শীর্ণ পাতার আড়ালে নীরবে চাপা থাকবে শায়িত মমির মতো। তবু শেষ এক অস্ফুট স্বর তরঙ্গায়িত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ শ্বাসে মিলিয়ে দেয় আমাদের জীবনের বোধ। আসলে সে বোধ নয়, বোধ নয়, বোধন, বোধন।

কেউ কেউ তাকে ভাবে ক্ষণিকের বিমূর্ত যাপন এক। আগন্তুকের মতো অহেতুক সংজ্ঞায়িত করা বিশেষ আবেগ সেখানে মাত্রা পায় আভিধানিকতায়। আসলে তা পরাকাষ্ঠা নয়, প্রেম, প্রেম।

❁ – ❁ – ❁

এমন একটা মানুষ থাকুক

কেয়া রায়

আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই প্রতিদিনের শেষে একটা এমন মানুষ থাকুক যার সাথে নির্দ্বিধায় নিজের শরীর খারাপের পরিমাণ, কারণ বা ফলাফল সব নিয়ে আলোচনা করা যায়। যার সাথে পারিবারিক সমস্যা হোক কিংবা অর্থনৈতিক সমস্যা ; রাজনৈতিক আলোচনা হোক কিংবা ধর্মীয় আলোচনা ; রোম্যান্টিসিজম থেকে শুরু হয়ে বিয়ের মণ্ডপ কিংবা রাগ-অভিমান থেকে হাসি-ঠাট্টা ; ননভেজ কথা থেকে ভেজ ; প্রেম থেকে ব্রেক-আপ কিংবা প্রাক্তন থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যত - জমে থাকা যাবতীয় কথা হোক নিঃসঙ্কোচে কোনও হিসেবনিকেশ ছাড়াই।

এমন একটা মানুষ থাকুক যে সময়বিশেষে আমাদের কথাগুলো শোনার জন্য শ্রোতাও হবে আবার তাদের জমে থাকা কথাগুলো বলে একটুখানি শান্তি পাওয়ার জন্য বক্তাও হবে। আমাদের ভালো থাকা, মন্দ থাকা জীবনের সবকিছুতেই সেই মানুষটা সাক্ষী থাকবে। প্রয়োজন পড়লে সে যেমন পরামর্শ দেবে তেমনি আমাদের কাছ থেকেও পরামর্শ নেবে। তার সাথে দশ মিনিটেও কথা শেষ হতে পারে আবার কথা হতে হতে ভোরও হতে পারে।

এমন একটা মানুষ থাকুক যার সাথে হয়তো বছরে একবার কি দু'বার দেখা হবে। কিন্তু প্রতিটা দেখা হওয়াগুলো যেন মনে দাগ কেটে থাকে ; পরবর্তী সাক্ষাৎ অবধি যেন একটা রেশ থেকে যায়। আমাদের জীবনটা যতটা জটিল হতে থাকবে ঠিক ততটাই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াতে শুরু করবে সেই মানুষটা আমাদের জীবনের সাথে ; অন্তত সারাদিনের ঝঞ্ঝাট-অশান্তি-চিন্তা-ব্যস্ততা তার কাছে খুচরো পয়সার মতো জমা রেখে দু'দণ্ড শান্তি খুঁজে পাওয়া যাবে নিভৃতে ঘুমোনোর জন্য।

এমন একটা মানুষ থাকুক যে আমাদের মাথাব্যথার মূহূর্তে, ভেঙে পড়ার মূহূর্তে, আগলে রাখার মূহূর্তে কাঁধটা এগিয়ে দিতে ভুল করে না। অশান্ত মনটাকে শান্ত করার জন্য যার কণ্ঠস্বর টুকুই যথেষ্ট; যে মানুষটার বুকে আশ্রয় আর নিরাপত্তা দুটোই খুঁজে পাওয়া যায় এক নিমেষে। শুধু সময় থাকতে থাকতে অপর প্রান্তের মানুষটাও যেন আমাদের জীবনের সাথে পা মিলিয়ে চলতে পিছপা না হয় - এটুকুই চাওয়া। বাকিটুকু হাতে হাত রেখে আর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঠিক পার করে নেব।

❁ — ❁ — ❁

দৃশ্যায়ন

মিঠু মণ্ডল

তার নিজের জীবনে কেউ কোথাও নেই। না বাপ, মা। না ভাই বোন। সে নিজে এই তল্লাটে কোথা থেকে এলো, তাও জানা নেই। জিজ্ঞাসা করলে হাসে। বোকার মতোই। তবে গাল ভরা নাম একটা আছে বৈকি, প্রসাদ। কার প্রসাদ আর কিসেরই বা প্রসাদ , সেটা অজানা।

প্রসাদ বড়ো হয়ে উঠলো রাস্তায়। গড়াগড়ি খেতে খেতেই। এখন তার সঙ্গী একটা তিন চাকার রিক্সা। প্রথম জীবন কেটেছে চা দোকানে। তখন সাফ করতো এঁটো কাপ প্লেট। সময়ের নিয়মে জোশ এলো শরীরে। আর হাতে জমানো কিছু টাকা। তারপর এর তার কাছে কিছু ধার। আর সব মিলিয়ে শেষে এই রিক্সা।

নিজের স্বাধীন ব্যাবসা। গড়গড়িয়ে চালাও। এখানে অপরের চোখরাঙানি বা কটকটে বাক্য কোনো কিছুরই তোয়াক্কার প্রয়োজন নেই।

এখন রিক্সাটি পুরোনো। জায়গায় জায়গায় ঝালাইয়ের তাপ্পি। তবুও কাঠামোটা বেশ শক্ত। প্রসাদ পোড়া মোবিল লাগায় নিয়মিত। তারপর এ গলি - ও গলি। যেন বাসট্রাকের সাথে গতির পাঞ্জা কষছে।

মাঝে মাঝেই অপ্সরী এসে বসতো সিটটাতে। জোর করেই। বারন করলেও শুনতো না। তাপ্পি মারা রঙ ওঠা কাপড়েও সে তখন রাজেন্দ্রানী। এক চক্কর ঘুরে আসার বায়নাও ধরতো যখন তখন। ওর জেদের কাছে হার মানতো প্রসাদ। ভাবতো, এই মেয়ের তো মাথা নিচু থাকে সবসময়ই। চার বাড়ির এঁটো বাসন, কাপড় ধোওয়াই যার রোজ নামচা, সেই মেয়ে তার কাছে এতো জোর পায় কোত্থেকে। আর এতো জেদই বা কিসের!

মাঝ রাত। অনেকটা মদ খেয়েছে প্রসাদ। শুয়ে আছে রিক্সার সিটেই। রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া নেই। নেই মানুষ জনও। শুনশান চারপাশ। কয়েকটা কুকুর ঘুর ঘুর করছে রিক্সার চারপাশে।

চোখ খোলার ব্যর্থ চেষ্টা। তবুও প্রসাদ বুঝতে চাইলো তার নিজের অবস্থান। জ্বরটা থেমেও যেন থামতে চাইছে না। ভর সন্ধ্যায় বৃষ্টি হয়েছে খানিক। ঠান্ডা হাওয়ায় শরীর জুড়ে ঠকঠকানি। ঠিক তখনই এসেছে অপ্সরী। হাতে রুটি তরকারি। আর অ্যালুমিনিয়ম গ্লাসে গরম চা। সবে প্রসাদের কপালে হাত রেখেছে, পিছনেই কালো টহলদারি জিপ। নিঃশব্দে এমন ভাবে থামলো যেন অপ্সরীর এখানে আসার কথা ওদের আগে থেকেই জানা।

— ওঠা, ওঠা এটাকে জিপে। মাঝ রাতে রিক্সার সিটে ফষ্টিনষ্টি ? যতোসব বেলেল্লাপনা ?

কিছু বোঝার আগেই সামনেটা ফাঁকা। প্রসাদের হাতের গ্লাসে তখনও ধোঁয়া ওঠা গরম চা। আর কানে বাজছে অপ্সরীর আর্ত চিৎকার— আমাকে বাঁচা প্রসাদ। কোথাও যাবো না আমি। কদিন আগেও আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল এরা। আটকে রেখেছিল সারারাত। কালো জিপটা অপ্সরীর আর্তনাদ বুকে বেঁধে আরো কালো হয়ে গেলো ক্রমশ।
নিস্ফল আক্রোশ। আর কিছু করতে না পারার অসহায়তা। আদরের রিক্সাতেই জোরে লাথি কষালো সাধারনের প্রসাদ।।

❁ — ❁ — ❁

স্বপ্ন

জাহির মল্লিক

ধড়মড় করে ঘুম থেকে উঠেই এক কিলোমিটার সাইকেল করে বাসস্ট্যান্ডে। বাস ধরার জন্য অপেক্ষাটা সেইদিন একটু বেশিই ছিল। তারপর বাস যখন এসে সামনে দাঁড়াল তা দেখেই চক্ষু চড়কগাছ। অপেক্ষারত অবস্থায় ভাবছিলাম যদি একটি সিট পাই বেশ আরামে গান শুনতে শুনতে গন্তব্যে পৌঁছানো যাবে। হাতে সময় খুব কম তাই উঠে পড়লাম ওই বাসেই। কোনোক্রমে পাদানিতে পা দিয়ে অতি কষ্টে গন্তব্যে পৌছালাম। এমন ঘটনাযে আগে ঘটেনি তা নয়, তবে আজকের ঘটনা যেন একটু বেশিই কষ্টকর।

যাই হোক গন্তব্যস্থলে নিজের পাঠ চুকিয়ে আবার বাড়ি ফেরার পালা। এক্ষেত্রে বলে রাখি তখন আমি স্নাতকোত্তর এর তৃতীয়পাঠপর্যায় পাঠরত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসটিতে হৈ- হুল্লোড় করতে করতে আসলেও আমার বাড়ি ফেরার জন্য পরবর্তী যে বাস তা ধরার জন্য কোথাও যেন একটু বেশি তাড়াহুড়ো করছিলাম। স্ট্যান্ড থেকে বাস ছাড়তে কিছুটা সময় লাগে তাই স্ট্যান্ডের সম্মুখভাগে যে বাস থাকে তাতেই উঠে পড়লাম। এক পলকে সারা বাস পর্যবেক্ষণ করে দেখলাম কয়েকটি খাপছাড়া সিট খালি আছে এবং পরপর কয়েকটি সিটে একজন করে বসে থাকলেও একটি সিট সম্পূর্ণ খালি আছে। আমার আবার জানালা খুব পছন্দের তাই স্বভাবতই ওই খালি সিট টিতে বসলাম।

গাড়ির চাকাগুলো যেন একটু সচলতা পেল। আমি জানালায় বসার দরুণ বাইরের কিছু টুকরো টুকরো দৃশ্য চোখে পড়ল, যা নিত্য দৈনন্দিন ঘটনার মতো।কিছুটা গিয়ে বাসটি একটু স্লো হল এবং আবার সেই আগের গতিতে চলতে লাগলো। চোখটা আমার বাইরের জগতেই পড়ে রয়েছে। হঠাৎ একটি বোরখা পরা মহিলা আমার সিটে এসে বসলেন। আমি সিটের যতটা স্থান দখল করেছিলাম তা ত্যাগ

করে সংকুচিত ভাবে জানালা ঘেঁষে বসলাম। আমি লক্ষ্য করলাম মহিলাটির হাতে একটি ছোটো ব্যাগ ও জলের বোতল আছে। আমার একটা হাত জানালাকে স্পর্শ করে আছে এবং মুখটি ক্রমাগত বাহিরের দিকে নিক্ষেপ।

আমার দুই কানে হেডফোন থাকায় একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম তাই একটি কান থেকে খুলে নামিয়ে রাখলাম। একটি গান ভালো না লাগায় গানটি চেঞ্জ করার জন্য ফোনের স্ি নে তাকিয়েছি ঠিক তখনই মহিলাটি বলে ওঠেন ভালো আছো। আমি স্বভাবতই একটু মৃদু হেসে উত্তর দিলাম হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।এমনিতেও নাচিনতে পারারই কথা কারণ, উনি বোরখার আড়ালে ছিলেন। উনি উত্তরে যা বললেন তাতে আমি প্রথমে কিছুটা মনে মনে রাগান্বিত হলেও স্বাভাবিক ছিলাম। বললেন আমি তোমাকে চিনি এটাই যথেষ্ট, আমাকে না চিনলেও চলবে।

গাড়ির গতি বেগ একটু দ্রুত হলো আর আমিও ক্লান্ত শরীরে ধেঁয়ে আসা বাতাসটাকে অনুভব করছিলাম। প্রশ্ন করলাম আমাকে কিভাবে চেনেন ? উনি বললেন তুমি (আমি যে কলেজে পড়েছিলাম তার নাম) ওইখানকার ছাত্র ছিলে। উনি আমার কলেজের বেশকিছু ঘটনা এবং আমার সম্পর্কে এমন কিছু উপস্থাপন করলেন যা শুনে আমি নিজেই হতভম্ব প্রায়। হাতটা জানালা থেকে সরিয়ে জলের বোতলের ছিপি খুলে জল নিয়ে ঢোক গিললাম। জানালা থেকে মুখটা সরাতে না পেরে বাইরের দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করলাম আপনি আমার সম্পর্কে এত কীভাবে জানেন ? উনি বললেন তোমার বাস থেকে নামার সময় খুব সংক্ষেপ (আমি তা ভাবিনি অথচ উনি আমার সময় সম্পর্কে সচেতন) তাই দু-চার কথাই বলি। আমার কিছুটা আপত্তি সত্ত্বেও দ্বিধা কন্ঠে বললাম বলুন। উনি বলতে লাগলেন.....

আমি তোমার কলেজে পড়তাম, তুমি যখন ফার্স্ট ইয়ার এ ভর্তি হও তখন আমি থার্ড ইয়ার। গোল্ডেন জুবলি অনুষ্ঠানে তোমার শ্রুতিনাটক শুনেছিলাম তখনই তোমাকে প্রথম দেখি। তারপর দেখার ইচ্ছেটা দিন দিন বাড়তে থাকে। তোমাকে দেখার জন্য আধা ঘণ্টা আগে কলেজে চলে আসতাম। বাস থেকে নামলে যাতে দেখতে পাই আর আজ সেই বাসেই হঠাৎ দেখা ভাবো কি আজব। ইউনিয়ন রুম থেকে তোমার নম্বরটা নিয়েছিলাম কিন্তু আজও ফোন করার সাহস হয়নি।

উনি হয়তো আরো কিছু বলতেন কিন্তু নম্বরটার কথা শুনে আমি একটু অবাক হয়ে বললাম আচ্ছা বলুন তো আমার নম্বরটা ? উনি যেমন দ্রুতগতিতে মুখে বললেন ঠিক তেমনই বলে ফেললেন সেভও আছে। আমি বললাম দেখতে পারি, উনি ফোনের লক টা খুলে নম্বরের জায়গায় "ডি" লিখে সার্চ করে যা দেখালেন তা

দেখেই আমি আঁতকে উঠি। আমার নামের জায়গায় ড্রিম। বললাম এই শব্দটা দিয়ে কেন সেভ করেছেন ? উনি কিছুটা না বলার ভঙ্গিতে বললেন থাক না সে কথা। কোন একটা আগুনের ঝলক পাস দিয়ে গেলে যেমন হয় আমিও ঠিক তেমন পরিস্থিতি অনুভব করলাম আর বললাম কারণটা জানলে খুশি হতাম।উনি চোখ দুটি বন্ধ করে এক নিমেষে উত্তর দিলেন "আমার স্বপ্ন"। একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন , স্বপ্নটা স্বপ্নই থাক, পূরণ করতে চাইনা। আজও বলতাম না কিন্তু দীর্ঘ ৪ বছর ৩ মাস পর দেখতে পেলাম তাই আবেগটা আর চেপে রাখতে পারলাম না, বলেই ফেললাম। তবে চিন্তা করো না কোনদিন ফোন বা এসএমএস করব না।

কথা হতে হতে বাসটা একটা স্টপেজে কিছুটা থামল, আর কয়েকটা সিট দূর থেকে একটি লোক ইশারা করছে এবং একটি বালক আগিয়ে আসছে আমাদের সিটের দিকে। কাছে এসে মা বলে মহিলাটির কোলে বসে গেল। শিশুটির বয়স আন্দাজ তিন বা চার বছর হবে। জানিনা এখন হয়তো আরও কয়েকটি শিশুর মুখে মা ডাক শুনে। আমি শিশুটির গালে হাত দিয়ে একটু আদুরে গলায় বলি বাবু তোমার নাম কী ? হঠাৎ মহিলা শিশুটির মুখ চেপে কথা ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন তোমার বাবার কাছে যাও। আমি একটু ক্রুদ্ধ হয়ে বললাম আপনার বাড়ি কোথায় ? কি নাম আপনার ? উনি কিছুভাবছিলেন, হয়তো শিশুটিকে আমার সাথে কথা বলতে দেয়নি সেটাই। উনি একটু ভাঙ্গা গলায় বললেন এগুলো জানার কোন প্রয়োজন নেই। আমি কণ্ঠস্বরটাকে একটু তীক্ষ্ণ করে বললাম বললে কি কোন অসুবিধা আছে ? উনার কন্ঠস্বরটা একটু মৃদু করে বললেন অসুবিধাটা আমার না তোমার। আমি বললাম মানে ? উনি উনার দার্শনিক লজিক উপস্থাপন করলেন.....

দেখো তোমাকে আমি চিনি, তুমি আমাকে চেনো না। আজকে চেনার পর থেকে তুমি হয়তো আমায় খুঁজতে থাকবে কিন্তু বিশ্বাস করো আমি তোমাকে কোন কষ্ট দিতে চাইনা। আমার পেছনে পড়ে থাকো এটাও চাইনা। তুমি যেমন আছো তেমন টাই আমি দেখতে চাই। জানিনা আর দেখা হবে কিনা , তবে হতেও পারে যেমন আজকের মত। আর সেই অপেক্ষায় থাকলাম। আমি উনার সম্পর্কে যা কিছুই জানতে চেয়েছি উনার একটাই উত্তর জানার দরকার নেই আর জানতেও চাইনা। বিগত ৪ বছর ৩ মাস স্বপ্ন হিসেবে দেখেছি আর বাকিটা না হয় এভাবেই কাটিয়ে দেব।

অবশ্য এই কথোপকথনের মাঝে একটা ঘটনা ঘটেছে, যখন বাস কন্টাকটর কাকু টিকিট কাটতে এসেছে তখন আমি আমার গন্তব্য স্থল বলতে কাকু বলে উঠলেন আরে সেতো দুটো স্টপেজ আগেই ছেড়ে চলে এসেছে, তুমি নামোনি কেন ? এই কেনর উত্তর আমার জানা ছিলনা। একটা অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে কন্ট্রাকটর কাকুকে বললাম চোখটা একটু লেগে গিয়েছিল। কন্ট্রাকটর কাকু একটু সরে যেতেই মহিলাটি একটু হেসে বললেন আমি জানতাম তোমার গন্তব্য, প্রথমে স্মরণ করিয়ে

ছিলাম কিন্তু তুমি খেয়াল করনি , আমি মনে মনে হাসছিলাম, বেশ ভালই লাগছিল তোমার বোকামো। আমি বললাম ভুলতো হয়েইছে , আপনার নামটা একটু বলুন ? উনি হাসতে হাসতে বললেন তুমি সাহিত্যের লোক সব বললে স্বপ্ন কি আর স্বপ্ন থাকে, তুমি জানোনা" না পাওয়াটাই স্বপ্ন" ।

উনার সঙ্গে কথা বাড়িয়ে যে বিশেষ পুলক অনুভব করব তারা আর জায়গা নেইএবং সেই ভেবেই পরবর্তী স্টপেজে নামার জন্য আমার ব্যাগটা তাড়াহুড়ো করে নামাতে থাকি। আমি সিট ছেড়ে বাসের গেটের দিকে ধীরে ধীরে এগোতে থাকি আর উনি মৃদু কণ্ঠে বলতে লাগলেন ভালো থাকবে, আর আজকের ঘটনাটা যেন স্বপ্নই থাকে। একদম সরু হৃদয়-নিংড়ানো কন্ঠে শুনতে পেলাম আর যেন গন্তব্য ভুল না হয় ,যা আজও কানে বাজে।

❁ — ❁ — ❁

উত্তর চাই

পার্থ সারথি চক্রবর্ত্তী

অবশেষে আশঙ্কা টা সত্যি ই হোল। মহামান্য হাইকোর্টের রায়ে সুকোমল বাবুর শিক্ষকতার চাকুরিটা চলেই গেল। প্যানেল লিস্টে তাকে বাড়তি নাম্বার দেওয়াই এর কারন। আসলে পার্টির সম্পাদক রমেন বাবুর অনুরোধ রাখতে দশ লক্ষ ঘুষ দিয়ে তার এই চাকুরি হয়েছিল। পরের বছর তার ই এক মাত্র মেয়ে কুহেলিকে বিয়ে করার বিনিময়ে। এখন সে বেকার। স্ত্রী পাশে থাকার বদলে কথায় কথায় টিপ্পনি দিতে পিছপা হচ্ছে না।

কথায় কথায় বলে, কি করবে এখন। মুরোদ তো কিছুই নেই তোমার। বাবা চাকুরি টা জোগাড় না করে দিলে আজ তোমার বিয়েও হত না। তখন পৈ পৈ করে বলেছিলাম টিউশণ টা শুরু কর, শুনলে না। এখন সামলাও। আমার বাবা কিছু আর সাহায্য করতে পারবে না। বলে দিলুম।

, , , তোমার বাবার সাহায্য চেয়েছি কি ? আমার যথেষ্ট ভালো র ?্যাংক ছিল। তোমার বাবার কথায় যদি তখন জমি বেচা টাকা টা না তুলে দিতাম আজ এই দশা হোত কি ?

কি এত বড় দুর্নাম। আমার বাবার জন্যই তোমার চাকুরি হোল আর তাকে আজ দোষ দিচ্ছ। ছি ছি তোমার মত বেইমান মানুষের সাথে আর না। আমি চললুম।

ছেলে অরিত্র কে নিয়ে পাশেই বাপের বাড়ী চলে গেল কুহেলি।

সুকোমল কিছু বলল না। নীরব রয়ে গেল। মা বেলা দেবী ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বলেন

শক্ত হ বাবা। এসম য় একটু মনে জোর আন।

মায়ের আঁচলে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল ছেলে। আসলে কদিন

ধরে তার খাওযা ঘুম সব উড়ে গেছে। এসময় স্ত্রী র পাশে থাকা টা খুব চাইছিল কিন্তু সেও ছেলে কে নিয়ে চলে গেল। কি করবে এখন। দেওয়ালে মাথা ঠুকতে লাগল না না সে আর এ জীবন রাখবে না। শেষ করে দেবে নিজেকে। কি লাভ। চারিদিকের অসম্মান, ঘৃণা, এমন কি নিজের সহধর্মিনী র ও গঞ্জনা। শেষ করে দেবে সে নিজেকে।

ধুম!ধাম!শব্দ শুনে মা পাশের রুম থেকে ছুটে এল।

এ অবস্থা দেখে সে ও অস্থির। দ্রুত ছেলেকে শান্ত করল। আমি আছি তো বাবা। আমি তোর পাশে।

---কিন্তু মা এ মুখ আমি কি করে সমাজে দেখাব

কি করব আমি ? কি ভাবে সংসার চালাব ? কোন কিছুই ভেবে কুল কিনারা পাচ্ছি না। আমি আর বাঁচতে চাই না মা। আমি নিজেকে শেষ করে দিতে চাই।

না বাবা ছেলে র মুখ চেয়ে তোকে বাঁচতেই হবে।

তা ছাড়া তুই তো আমায় গহনা গড়ে দিয়েছিলি তা বেচে একটা ব্যাবসা করিস। সব ঠিক হয়ে যাবে।

আজ রাতে শ্বশুর মশাই ফোন করে সুকোমল কে। নারী নির্যাতনের জন্য তোমার নামে কোর্টে কেশ করেছি। মেয়ে কুহেলি কে তুমি যদি ডিভোর্স না দাও আদালতে দেখা হবে।

আজ সংবাদ পত্রের প্রথম পাতায় হেডলাইন, " যারা বেআইনি ভাবে শিক্ষকতায় নিয়োগ ছিলেন সমস্ত বেতন মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশে পরিশোধ করতে হবে। "

সারা রাত একা ছট পট করে সুকোমল। স্ত্রী র নামে শহরে জায়গা কিনে বাড়ী বানাতেই সব শেষ। কি করে পঁচিশ লক্ষ টাকা সরকার কে পরিশোধ করবে সে। পাশে মা ছাড়া কেউ নাই তার।

ছেলে অরিত্র কে খুব মনে পড়ছে সুকোমলের, একটু যদি আধো আধো হাসি আর তুলতুলে হাত টা এসম য় তার গালে আলতো ছোঁয়া দিত''''''হয়ত, , , , ;;

ভোরে দুয়ারে ন্যাতা দিতে গিয়ে মা ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে থাকা নিথর সুকোমলের দেহ টা নামাতে গিয়ে তার হাউ হাউ আর্তনাদ অনেক কিছুর প্রশ্ন রেখে গেল, , ,

, , , তার এ অবস্থা র জন্য দায়ী কে ? ?

স্ত্রী, সমাজ, সংসার সরকার নাকি সে নিজেই ? ? ? ? ?

❁ — ❁ — ❁

সর্বজনীন

অমৃত ঘোষ

জঙ্গলমহলের এক প্রত্যন্ত ও প্রান্তিক গ্রাম। সন্ধ্যে একটু গড়ালেই ঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসে। অচিরেই তমসাবৃত গ্রামটি নিস্তব্ধতার গহীনে হারিয়ে যায়। জনবসতি খুব বেশি নয়, পঞ্চাশ-ষাট ঘর হবে জাতি-উপজাতি সব মিলিয়ে। ভারতীয় সংবিধানের প্রয়াসে খাতায় কলমে জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা সেকেলে হয়ে গেলেও জনমানসে এখনও তা হিমশৈলের চূড়ার মতো অনেকাংশেই বিদ্যমান। অলিখিত নিয়মে উপজাতিরা নিজেদের গুটিয়ে রাখে। পূজাঅর্চনা বা সামাজিক অনুষ্ঠানে তাদের প্রত্যক্ষ অংশীদারিত্ব তেমন নজরে আসে না। গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। তাদের বহির্বিশ্ব বলতে কিলোমিটার দশেক দূরের বাসস্ট্যান্ড সম্বলিত একটি চক, কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দোকান আর বারো-পনের কিলোমিটার দূরের একটি রেল স্টেশন। পাপু এই গ্রামেরই বিশোর্দ্ধ এক তরুণ। শিক্ষিত, উদ্যমী, পরিমার্জিত ও পরিবর্তনশীল ব্যক্তিত্বপূর্ণ। বেশিরভাগ যুবকেরা কৈশোরেই উপার্জনে মন দিয়েছে। কৃষিকাজের প্রথা ভেঙে কেউ কাপড়ের কলে , কেউ চকের মুদি দোকানে যোগানদারের কাজে যোগ দিয়েছে দুটো কাঁচা পয়সার মুখ দেখবে বলে। তবে পাপু স্নাতকোত্তরের বৈতরণী পেরিয়ে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়। গৃহশিক্ষকতা করে, গ্রামের অন্তর্বর্তী ফুটবল, ক্রিকেট টুর্নামেন্ট পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করে। সেইসঙ্গে ফি-বছর গ্রামে হয়ে আসা দূর্গা বা সরস্বতী পূজায় অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করে। দু'বছর হলো নিজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বসন্ত উৎসব ও দুর্গাপূজা উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু করে ভালো রকম সাড়া পেয়েছে। এবছর দুটি কি চারটি মুখ বাদ দিলে আসন্ন শারদানুষ্ঠানের নাটক ও নৃত্যানুষ্ঠানে ইচ্ছুক অংশগ্রহণকারী জুটিয়ে তোলা খুব মুশকিল হয়ে পড়েছিল। কেও মামাবাড়ি যাবে , কেও বলছে 'কি হবে করে?', কারুর বাড়ি থেকে মানা আছে, যুক্তি এইরকম যে 'মেয়ে বড়ো হয়েছে মধ্যে নাচবে না। কেউ আবার গৃহশিক্ষকের মান রাখতে রাজি হয়েছে। নাটকে অংশগ্রহণকারী দু'একজন তো শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসল-'বাবা পুজোয় দোকান দিয়েছে তা সামলাতে হবে'। অনুষ্ঠানের পর্ব এবার পন্ড হওয়ার উপক্রম। মন্দের ভালো শেষমেশ ঠিক করলো নাটক বা নৃত্যানুষ্ঠান কোনোটাই বন্ধ না রেখে যে ক'জনকে পাওয়া গেছে তাদের নিয়েই সপ্তমীতে ছোট্ট করে একটা অনুষ্ঠান করে ফেলা হবে। সেইমতো যথাসম্ভব মহড়াও হলো।

ইপ্সিত সন্ধ্যায় একপশলা ভারী বর্ষণ শেষে নিরন্তর গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়েই চলেছে। তবু আশা রেখে পূর্ব পরিকল্পনামাফিক সে মাইকে

ঘোষণা করলো 'আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হতে চলেছে .....আসুন, সকলে মিলে এই সাংস্কৃতিক শারদসন্ধ্যানুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করে তুলি।'

ইলশেগুড়ি বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দুজন একজন করে মঞ্চের চারপাশে ইতস্তত জমায়েত হতে শুরু করল।

তারমধ্যে উপজাতি সম্প্রদায়ের বেশ কিছু মানুষজনকেও দেখা গেল মঞ্চপার্শস্থ অনুজ্জ্বল একটা কোণে। তাদের স্থান যেন সমাজের ওই অন্ধকার কোণাতেই সীমাবদ্ধ। অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত। সূচনাতেই যেন সমাপ্তির বিদারী অস্তরাগের আবহ কানে ভেসে আসছে। হঠাৎই মঞ্চের কোনে উপস্থিত উপজাতির সম্প্রদায়ের মধ্যে পাপু একটা তরঙ্গ লক্ষ্য করে। স্বপ্রনোদিত কয়েকজন মঞ্চের সামনে এসে জুলুজুলু চোখে তাকে শুধায় "তুমাদের মঞ্চয় আমরা আমদের ঠারের (সাঁওতালি) কয়েকটা গানে নাচ করতে চাই। দিবি কি তরা ?"

তাদের উচ্চারিত সে ভাষার না ছিল কোনো চাকচিক্য, না ছিল ব্যাকরণগত নির্ভুলতা। তবুও অজ্ঞাত এক অমূল্য প্রাপ্তির অপার প্রশান্তিতে পাপুর গলা বুজে আসে।

অনুষ্ঠান যখন শেষ হয় তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। আনন্দাশ্রু সংবরণ করে শক্ত হাতে মাইক্রোফোনটা তুলে নিয়ে "সর্বজনীন" শব্দটিতে আরও একটু বেশি জোর দিয়ে সে তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ঘোষণা করে "শিয়াড়কেটিয়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পক্ষ থেকে আবারও আপনাদের সকলকে জানাই শারদীয়ার সাদর আমন্ত্রণ।"

❁ – ❁ – ❁

স্বপ্ন

বিশ্বজিৎ দাস

আমি ও শুভ্র একই বিদ্যালয়ে, একই শ্রেনিতে পড়ি। আমরা একে অপরে প্রিয় বন্ধু।আমাদের স্কুলের নাম এড়গোদা নিত্যানন্দ বিদ্যায়তন।একদিন বাংলা ক্লাস চলাকালীন আমাদের বাংলার শিক্ষক মহাশয় অচিন্ত বাবু সবাইকে নিজের স্বপ্নের কথা বলতে বললেন, অর্থাৎ, বড় হয়ে কে কী হতে চায়। তো রীতিমতো একে একে সবাই নিজেদের স্বপ্নের কথা বলতে থাকল। হঠাৎই আমার চোখ পড়ল শুভ্র-এর উপর। সবাই যখন হাসি খুশিতে ব্যস্ত, তখন শুভ্র আপন মনে জানালার বাইরের দিকে তাকিয়ে কী যেনো ভাবছে। আমি ওকে জীজ্ঞাসা করলাম "কীরে কী ভাবছিস ?", ও তখন চাপাস্বরে উত্তর দিলো "কই কিছু না তো, এই বাইরের দৃশ্যটা দেখছিলাম। সত্যিই প্রকৃতি কত সুন্দর বল ?" আমি বুঝতে পারলাম ওর মনের মধ্যে কোনো একটা উষ্ণ প্রদাহ বয়ে চলেছে। বংশি পাড়ায় শুভ্রর বাড়ি। ওর বাড়িতে ও, ওর মা, অসুস্থ বাবা এবং একটি দিদি থাকে। আয় বলতে ওর মা সামনেই একটি অঙ্গনওয়াড়িতে রান্না করে যা পায়, তা দিয়েই দিন চলে যায়। শুভ্রর বাবা দু'বছর ধরে বিছানাগত। শুভর দিদির বিয়ের বয়স হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের পারিবারির অবস্থার জন্যে কেউ তাদের বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেনা।

এমনি সময় হঠাৎই অচিন্ত বাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল আমাদের লক্ষ করে।

আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আমি বড় হয়ে কী হতে চাই ? আমি উচ্চস্বরে বললাম ক্রিকেটার। ক্লাসশুদ্ধ সবাই হেসে উঠল। প্রীয়ম বলে উঠল "তুই তো বল করতেই পারিস না আর না ব্যাট করতে। তুই কী শুধু ফিল্ডিং করবি ?" ক্লাসে এমন কয়েকটা বন্ধু থাকবেই। অচিন্তবাবু সবাইকে থামিয়ে শুভ্রর দিকে তাকিয়ে একই প্রশ্ন করলেন। প্রশ্ন করার পর কিছুক্ষণ সারা কক্ষ নিস্তব্ধ। এর পরে দীর্ঘশ্বাসে ছেড়ে শুভ্র বলল - "স্যার স্বপ্ন ? আমাদের স্বপ্ন হয় না স্যার। আমরা রাত্রিতে স্বপ্ন দেখি, যা সকাল হলেই ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। গোটা ক্লাস নিস্তব্ধ। শুভ্র আরও যোগ করে বলল "আমাদের স্বপ্ন মানে কোনো উঁচু জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া নয়, নিজে উপার্জন করে মা এবং বাবার জন্য কিছু করা।

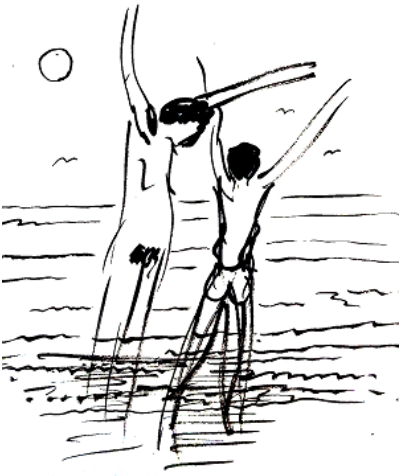

ক্লাস শেষে আমরা একজায়গায় টিফিন করছি, সেইসময় আমি শুভ্রকে বললাম কীরে, তুই তো কবি, দার্শনিকদের মতো কথা বলছিস"। ও আমার দিকে একবার তাকিয়ে নিজের টিফিনের মধ্যেকার শুকনো দুটো রুটি আর খানিক চিনির দিকে মনযোগ দিল। আমি আমার আমার কাছ থেকে কিছুটা আলু ভাজা ওকে তুলে দিলাম। প্রথমে নিবো না, নিবে না করলেও আমি কী আর ছাড়বার পাত্র। অবশেষে তাকে আমার কাছে হার মানতেই হল। টিফিন খাওয়ার ফাকে আমি ওকে আবার প্রশ্ন করেই দিলাম "হ্যাঁরে সত্যি করে বলবি তুই বড়ো হয়ে কী হতে চাস ?"

- "ওই তো অচিন্ত বাবুর ক্লাসে বলেই দিলাম।"

- "দেখ তুই দার্শনিক সূলভ কথা বলে আমাকে বোকা বানাতে পারবি না"

অবশেষে, টিফিনটি একদিকে রেখে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল "শোন তাহলে এই বলে সে বলতে শুরু করল।

সালটা ছিল ২০১১, তখন আমার বয়স ১১ বা ১২। আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি। আমার খেলার প্রতি ছোটোবেলায় সেরকম আগ্রহ ছিল না। আমাদের পাশের বাড়ির এক দাদা ক্রিকেটভক্ত ছিল, তো ভারতের খেলা থাকলে রীতিমতো টিভি খুলে তাদের বাড়িশুদ্ধ সবাই দেখতো। আর দেখবেই না কেন, বিশ্বকাপ বলে কথা। আমি একদিন টিভিতে ম্যাচ চলাকালীন জানালা দিয়ে উঁকি মারছিলাম, সেই সময় হাবুদা আমায় দেখে ফেলে। তার পর আমাকে ভিতরে এসে খেলা দেখতে বলল। তারপর আমি ভিতরে ঢুকে এক জায়গায় বসে খেলা দেখতে লাগলাম। খেলাটি চলছিল ভারও বনাম শ্রীলঙ্কার মধ্যে ফাইনাল ম্যাচ। সেই ম্যাচে কী হয়েছিল তোকে

তো আর বলতে হবে না রে, তুই তো ক্রিকেটার

-"নারে আমি জানিনা কী হয়েছিল। আমার তো এই দুমাস হল ক্রিকেটের প্রতি ইন্টারেস্ট এসেছে।"

এটা বলার পরেই সে বিস্ময় দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি ওকে পরের ঘটনা বলতে বললাম।

"আমার সেই খেলাটিতে ভারতীয় অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনীর ইনিংসটি ভালো লেগেছিল। জানি না কেন সেই থেকেই তার প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি এবং সেই থেকেই আমার ক্রিকেটের প্রতি আকর্ষণ, ভালোবাসা শুরু। সেই ছেলেটা যে ক্রিকেটের কিছুই জানত না দুই বছরের মধ্যেই সে খেলায়, ক্রিকেটিং ব্যাপার নিয়ে হাবুদা কেও টপকে গেল। চারিদিকে আশে পাশে আমার নাম ছড়িয়ে পড়ল। আমার রোল ছিল বোলিং অলরাউন্ডার। আমিও চেয়েছিলাম আমার হাতেও একদিন বিশ্বকাপ আসবে এবং আমার ভগবান ধোনি। ভারতীয় অধিনায়কের সাথে দেখা করার সৌভাগ্য মিলবে কিন্তু..."।

এই বলে সে একেবারে কোথায় যেন সে হারিয়ে গেল। আমি নিরবতা ভেঙে বললাম "কি কিন্তু?"

-"আমি কম্পিত কণ্ঠে মাকে গিয়ে বলি "মা প্রতিমাসে দুশো টাকা করে দেবে? ওই শক্তিদা ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হতে বলছিল। আর আমারও মন আছে

- "অ্যাকাডেমি ? না বাবা পারবো না। তুই তো দেখছিস আমরা কী? আমাদের অবস্থা, তোর বাবার শরীর খারাপ, খুব একটা রোজগার করতে পারে না আর না আমি। মাসিক পাঁচশো-হাজার টাকার সংসার আমাদের, চারজন লোক। ওসব খেল-টেল আমাদের জন্য না। তুই বরং পড়াশোনা কর। পড়াশোনা করে অনেক বড় হয়ে ওঠ।"

আমি জেদ না করে, বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে বলেছিলাম- "আচ্ছা মা ঠিক আছে। অনেক অভিমান নিয়ে বলেছিলাম" আমি পড়াশোনা করে চাকুরি করব"

সে আবার গভীর স্বপ্নে হারিয়ে গেলো। এমন সময় টিফিন শেষের ঘন্টা বেজে উঠল। আমরা ক্লাসের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। ক্লাসে প্রবেশ করার আগে সে আমাকে বলল "প্রীয়ম তোর কাছে টাকা আছে রে কিন্তু ক্রিকেটের প্রতি কোনো প্রেম, ভালোবাসা নেই। তুই চাইলেই অনায়াসে ভালো ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে জয়েন হয়ে একজন ভালো খেলোয়াড় হতে পারবি, কিন্তু ক্রিকেটার না। আর আমার কাছে ক্রিকেটার হওয়ার সমস্ত গুন আছে, কিন্তু যেটা একান্তই দরকার সেটা নেই রে। আমাদের যে স্বপ্ন দেখতেই মানা।"

এই বলে সে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে, পিঠ থাপড়ে ক্লাসের মধ্যে প্রবেশ করল।

● — ● — ●

স্বামী বিবেকানন্দের বাস্তবিক বেদান্ত ও মানবধর্ম

তমাল চক্রবর্ত্তী

বর্তমান ধর্মান্ধতা ও জাতি বিদ্বেষপূর্ণ এই পৃথিবীতে কোন মানুষ কে যদি জিজ্ঞেস করা যায় তুমি কোন ধর্মে বিশ্বাস করো, সে অবশ্যই বলবে , মানবধর্ম। ইংলিশে অনুবাদ করলে দাঁড়ায় হিউম্যানিজম। হিউম্যানিজম এর উৎস সন্ধানে যদি একটু যাই তাহলে দেখতে পাবো এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা বলছে এই আধুনিক মতবাদ ইতালিতে উদ্ভূত হয়েছিল পরে ইউরোপের বাকি অংশ, ইংল্যান্ড এবং গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়েছে। "...humanism, system of education and mode of inquiry that originated in northern Italy during the 13th and 14th centuries and later spread through continental Europe and England."

"সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই" এই বাণী যে মানবধর্মের মূল কথা; দর্শন হিসাবে তার পোশাকি নাম হিউম্যানিজম হয়তো ইটালিতে শুরু হয়েছিল। কিন্তু বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল যে ভারত ভূমিতে যেখানে বেদ, উপনিষদ এর মতন জ্ঞানের গ্রন্থের বিকাশ হয় সেই ভারত ভূমিতে এই মানবধর্মের অস্তিত্ব অনুসন্ধানে অনেক গভীরে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু স্বল্প পরিসরে আমরা সবচেয়ে সহজ পথ স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা ও দর্শনের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির দর্শনের এই দিকটি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করবো।

স্বামীজি তাঁর দর্শন কে বলতেন 'প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত'। স্বামীজীর প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত দর্শনে যাওয়ার আগে আমরা একটু জানি ' বেদান্ত কি ' এই নিয়ে। বেদ যে অফুরন্ত জ্ঞানের ভান্ডার আমাদের কাছে তুলে ধরেছে তা প্রকারভেদে সাধারণত চারটি অংশে ভাগ করা হয়। যে অংশে বৈদিক মন্ত্র থাকে তাকে বলা হয় সংহিতা, এরপর ব্রাহ্মণ , আরণ্যক ও অবশেষে অন্ত বা শেষ জ্ঞান উপনিষদ দর্শন , যা এই বেদান্ত নামে পরিচিত।

এই বেদান্ত দর্শন সম্পর্কে ভুল ধারণা হচ্ছে যে এটি আদি গুরু শঙ্করাচার্য সৃষ্টি করেছেন, তা ঠিক নয়। ভারতীয় দর্শনের অন্যতম এই দর্শন এটির সৃষ্টিকর্তা হলেন ব্যাসদেব। আদি শঙ্করাচার্য এই দর্শনের তিনটি বিশেষ পুস্তক যথা গীতা , উপনিষদ ও ব্রহ্মসুত্রের রচনা করেন এবং তিনি ব্যাপকভাবে এই বেদান্ত দর্শন কে সারা ভারত ব্যাপী প্রচার করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক ভারতে এবং বিশ্বে তা সর্বাধিক প্রাসঙ্গিকতা লাভ করে স্বামী বিবেকানন্দের হাত ধরে। যদিও তার আগে রামমোহন রায় শুরু

করেছিলেন বেদান্তর দর্শনের প্রচার। স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত হল বাস্তবিক বেদান্ত , তিনি বলতেন শংকর বেদান্ত কে বনে রেখে এসেছেন উনি সেই বনের বেদান্তকে ঘরে ঘরে পৌছে দিয়েছেন। পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের ভিন্ন উপাসনার পথ, ঈশ্বরের রূপ এসব থেকেই শুরু হয় ভেদাভেদের। বেদান্ত কি শুধুই একটি ধর্ম দর্শন যা নির্দিষ্ট উপাসনা পদ্ধতির কথা বলে ? না স্বামীজীর বাস্তবিক বেদান্ত নির্দিষ্ট উপাসনা পদ্ধতি বা নির্দিষ্ট ধারণার ঈশ্বরের কথা বলে না। বেদান্ত মানুষের একত্বের কথা বলে, এর মূল কারণ খোঁজার চেষ্টা করে এবং সেই একত্ব কে অনুধাবন করার কথা বলে। কিন্তু বাস্তবে আমরা যখন তাকাই তখন দেখি সমাজে বহু রকমের বিভিন্নতা ধনী মানুষ, গরিব মানুষ, কালো চামড়ার মানুষ সাদা চামড়ার মানুষ, মেয়ে মানুষ , ছেলে মানুষ, আবার তৃতীয় লিঙ্গের মানুষও আছে এই এত বিভিন্নতা ; এর মধ্যে আছে কি এমন একত্বের সূত্র যা অবলম্বন করে মানব সমাজ একত্বের অনুভব করতে পারে। স্বামীজি সহজ করে বলছেন,

"প্রত্যেক মানুষকে বেদান্ত এই শিক্ষাই দেয় সে এই বিশ্ব - সত্তার সহিত এক ও অভিন্ন তাই যত আত্মা আছে, সব তোমারই আত্মা ; যত জীব দেহ আছে, সব তোমারই দেহ ;কাউকেও আঘাত করার অর্থ নিজেকেই আঘাত করা এবং কাহাকেও ভালোবাসার অর্থ নিজেকেই ভালোবাসা। তোমার অন্তর হইতে ঘৃণা রাশি বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অপর কাহাকেও তাহা আঘাত করুক না কেন, তোমাকেই আঘাত করবে নিশ্চয়ই। আবার তোমার অন্তর হইতে প্রেম নির্গত হলে প্রতিদানে তুমি প্রেমই পাইবে, কারণ আমিই বিশ্ব -সমগ্র বিশ্বেই আমার দেহ।"

বিশ্ব মানবতাকে এক রাখার এই চিন্তাকে শুধু পুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি বিবেকানন্দ, তিনি চেয়েছিলেন তা যেন বাস্তবে রূপ পায়। মানুষ যেন তার দৈনন্দিন কাজে এর প্রয়োগ করতে পারে তবেই প্রকৃত একত্বের ও সমত্ব বিকাশ সম্ভব হবে। আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ এই একত্ব আনার চেষ্টা করেছে বস্তুবাদী দর্শনের দ্বারা। কিন্তু বাস্তবে যদি বস্তুবাদী দর্শনের মাধ্যমে এই একত্ব আনা সম্ভব হত, তাহলে আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমেরিকার মতো উন্নত দেশে কালো চামড়ার মানুষ হবার জন্য খুন হতে হয়, আইএসআইএস জঙ্গিদের হাতে ইয়াজেদি মানুষেরা খুন হয়। সারা পৃথিবীতে ছেয়ে আছে এরকম অজস্র উদাহরণ। এগুলো তো গেলো আন্তর্জাতিক বিষয়ের কথা, ব্যক্তিজীবনেও আমরা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছি, নিত্যনতুন ভোগের তাড়নায় খুব একা হয়ে যাচ্ছি। তাই তো বাড়ছে আত্মহত্যার প্রবণতা, অবসাদ, ঘরোয়া হিংসা প্রভৃতি, তাই অর্থ সম্পত্তি প্রভৃতির বস্তুবাদী শৃঙ্খল কখনোই মানুষকে এই ভেদাভেদের চিন্তা থেকে মুক্ত করতে পারবে না। উপনিষদ এই ভোগবাদের অবসানে বলছে, ভোগ ততটাই করো যতটা তোমার প্রয়োজন বাকিটাতে তোমার কোন অধিকার নেই; বাকিটা সমাজের জন্য ত্যাগ করো।

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যতকিঞ্চ জগত্যাং জগত।
তেন তাক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্।।"

এখন চতুরাশ্রম প্রথা নেই , তাই এই আধুনিক পৃথিবীতে উপনিষদের দর্শনের বাস্তবিক প্রয়োগ কিভাবে সম্ভব, এই সম্পর্কে স্বামীজি লন্ডনে চারটে লেকচার দিয়েছিলেন ১৮৯৬ সালে ১০ নভেম্বর থেকে ১৮ নভেম্বরের মধ্যে লন্ডন শহরে।

প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত নামে পরিচিত এই লেকচার পর্বের শুরু করেছিলেন , " I have been asked to say something about the practical position of Vedanta philosophy. As I have told you, theory is very good indeed, but how are we to carry it into practice? If it be absolutely impracticable , no theory is of any value whatever , except as intellectual gymnastics"

বাস্তব প্রয়োগ না হলে সেই দর্শনের কোনো গুরুত্ব নেই তা সে যত সুন্দরই হোক না কেন। কিন্তু এখানে সংশয় জাগে বেশিরভাগ ধর্ম-দর্শন মানুষকে বাস্তব জীবন সম্বন্ধে উদাসীন করে তোলে, জীবনের দুঃখ কষ্ট মুছতে বা অনাচার অবিচার এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে চায় না।

সে মনে করে কোন এক ঐশ্বরিক শক্তি এসে তার উদ্ধার করবে। তাই ভারতবর্ষের বীর বিপ্লবী শহীদ ভগৎ সিং তার বিখ্যাত গ্রন্থ Why I am atheist গ্রন্থে সমস্ত আস্তিক দর্শনের অসারতা তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করতেন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীরা শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারছে না, তার কারণ তারা মনে করে যুগে যুগে যখন অত্যাচার হয় ভগবান সামনে এসে উদ্ধার করেন, এক্ষেত্রেও তাই করবেন।

"ঈশ্বরের উৎপত্তি সম্পর্কে আমার মত হলো এই যে মানুষের সীমাবদ্ধতা অনুধাবন করে এবং তার দুর্বলতা ও অক্ষমতা বিবেচনা করে কল্পনায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব সৃষ্টি করা হয়েছিল সাহসের সঙ্গে বিপজ্জনক সমস্ত ঘটনার সম্মুখীন হতে মানুষকে উৎসাহিত করার জন্য এবং প্রতিপত্তি ঐশ্বর্যে তার যে বিস্ফোরণ তাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য।"

কিন্তু Practical Vedanta তে এই কথার অনুরনন দেখা গেছে। স্বামীজী বলছেন ঈশ্বর বা তার দূত রা যে ছিলেন তার প্রমাণ কি ? শুধু কিছু বইয়ের পাতা ? না তার তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ সবচেয়ে মানুষ ও তার প্রাণসত্তা ,

"বেদান্তের মূল কথা - একত্ব বা অখন্ডভাব। দুই কোথাও নেই , দুই প্রকার জীবন অথবা দুটি জগৎও নেই। ...একটিমাত্র জীবন আছে , একটিমাত্র জগৎ আছে,একটি মাত্র অস্তিত্ব আছে। সবই সেই এক সত্তা। প্রভেদ শুধু পরিমাণগত প্রকারগত নয় (in degree, and not in kind)। আমিও যেমন, একটি ক্ষুদ্র জীবানুও তেমন - প্রভেদ কেবল পরিমাণগত ...।"

অর্থাৎ বাস্তবে আমি যেমন আমার সমস্ত আবরণ সরিয়ে জাতি ধর্ম ভাষা বা চামড়ার রঙ সবকিছু বাদ দিয়ে ভেতরের যে চেতনা তাকে অনুভব করতে হবে এবং সেই চেতনার বিস্তার সর্বত্র। সেই চেতনা কম মাত্রায় পশু-পাখির মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে, সকলের মধ্যে আছে আছে তা

অনুধাবন করলে এই একত্ব অনুভব করা সম্ভব এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করাও সম্ভব। ইশ্বর সেই সর্বত্র বিরাজমান চেতনার সমষ্টির প্রতীক। তাই সমস্ত মানব সমাজ সেই চেতনার অন্তর্গত। ব্যক্তি ঈশ্বরের ধারনা নয় বেদান্ত সব কিছুতেই ঈশ্বর জ্ঞান করে। তবে মানবদেহে তার সর্বোত্তম প্রকাশ। তাই প্রতিটি মানুষ বাস্তবে সেই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি।বেদান্তের এই চিন্তাই মানবধর্মের আধ্যাত্মিক ভিত্তি। স্বামীজী দীপ্ত কন্ঠে বলছেন

" If you are not a Prophet there never has been anything true of God. If you are not God , there never was any God, and never will be."

স্বামীজীর মতো এই বেদান্তর সিংহনাদ দেখা যাচ্ছে পরবর্তীতে সুভাষচন্দ্রের মধ্যে। তিনি নির্ভীক, ব্রিটিশ বিদ্বেষী কিন্তু সাথে ছিলেন চরম মানবপ্রেমী। তাঁর কাছে স্বাধীনতা ছিলো মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা।

"আজ যাহারা সমাজের কাছে অস্পৃশ্য, যাহাদের জলচল নাই, যাহারা মনুষ্যত্বের অধিকার ভোগ করতে পারে না, যে পর্যন্ত না তাহাদিগকে মনুষ্যত্বের আসনে বসাইতেছি, যে পর্যন্ত তাহারা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবে - আমরা বাস্তবিক মুক্তিকামী। চন্ডীদাসের বুলি মুখে আওড়াই বটে - 'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই ' কিন্তু কয়জন তাহা কার্যে পরিণত করে করিতে পারে ?"

তাই জগতের বিভেদকামী মানসিকতার পরিবর্তন করতে প্রাচীনকালের এই ভারতীর দর্শন আধুনিক মানুষকে বাস্তবে দিশা দেখাতে পারে। স্বামীজীর মনে করেন কিছু মানুষ যদি বেদান্তের একত্বের তত্ত্ব কে কিছুক্ষণের জন্য অনুধাবন করে তাহলেই জগত পরিবর্তন হয়ে যাবে।

"যদি পৃথিবীতে যত নরনারী আছে, তাদের লক্ষ ভাগের এক ভাগ শুধু চুপ করে বসে খানিকক্ষণের জন্যও বলে - 'তোমরা সকলেই ঈশ্বর; হে মানবগণ, পশুগণ , প্রাণিগণ, তোমরা সকলেই এক জীবন্ত ঈশ্বরের প্রকাশ।' - তাহলে আধঘন্টার মধ্যেই সমস্ত জগৎ পরিবর্তিত হয়ে যাবে।"

সূত্র :

১. Practical Vedanta- Swami Vivekananda - Twenty- third Reprint, November 2010, Advaita Ashrama.

২. আমার ভারত অমর ভারত- স্বামী বিবেকানন্দ-সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী প্রকাশন- রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন।

৩. বিবেকানন্দের আলোয় সুভাষ- নন্দ মুখোপাধ্যায়- অষ্টম মূদ্রণ মে ২০১৩- রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার

৪. Why I am atheist- Bhagat Singh ebook from internet

❁ — ❁ — ❁

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘চিলেকোঠার সেপাই’ : আগমনেই আবির্ভাব

স্বপনকুমার মণ্ডল

ইতিহাসের সঙ্গে উপন্যাসের নিবিড়তা নানাভাবেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। সেখানে উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরে সময়ের অনুবাদ অত্যন্ত স্বাভাবিক। আধুনিক জীবনের বহুমুখী বিস্তার ও রূপান্তর উপন্যাসের শিল্পরূপের মধ্যে প্রথমাবধি মূর্ত হয়ে চলেছে। সেই মূর্তি তার আবেদনে কখনও মাইলফলকে পরিণত হয়েছে, কখনও আবার তা তীব্র আবেদনে প্রতিমা হয়ে উঠেছে। বস্তুবিশ্ব থেকে মননবিশ্বে তার বিস্তার লক্ষণীয়। বিশ শতকে উপন্যাসের বহুমাত্রিক চলনে ব্যক্তিচৈতন্য থেকে সমাজমনস্কতায় তার বিচিত্রবিহারী প্রকৃতি বর্তমান। সেখানে ব্যক্তিমানসের আত্মানুসন্ধান থেকে আত্মাবিষ্কারে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপস্থিতি যেভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে, সেভাবে তার সামাজিক অস্তিত্বের পরিচয় শিথিল হয়ে পড়েছে।

সেদিক থেকে উপন্যাসের ব্যক্তিজীবনের প্রতি যেভাবে আধুনিক জীবনের ছায়া ক্রমশ কায়ায় বিস্তার লাভ করেছে, সেভাবে সমাজমানসের বহুমাত্রিক পরিচয় নিবিড়তা লাভ করেনি। সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষের উত্তরণে ব্যক্তিমানসের পরিচয়ের প্রতি উপন্যাসের অভিমুখই সেক্ষেত্রে তার সামাজিক অবস্থানের প্রতি বিমুখ করে তোলে। সেখানে আধুনিক জীবনে স্বাধীন জীবনের কথায় সমাজের বন্ধনকে উপেক্ষা করতে গিয়ে অস্বীকার করার প্রবণতায় স্বাভাবিক ভাবেই তার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টির বড় অভাব দেখা দেয়। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তার পরিচয় নানাভাবেই প্রকাশমুখর। বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে চারিত্রিক উত্তরণের বৈচিত্র্য যেভাবে ক্রমশ আন্তরিক হয়ে উঠেছে, বৈষম্যপীড়িত সমাজবাস্তবতার পরিচয় সেভাবে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। তার ফলে উপন্যাসের সঙ্গে সমাজমানসে ইতিহাস ক্রমশ নিবিড়তা হারিয়েছে। সময়ের অনুবাদে যেভাবে ব্যক্তির উত্তরণের দিশায় তীব্র আবেদনক্ষম হয়ে উঠেছে, সেভাবে তার সমাজের বিবর্তনের ধারা প্রবাহিত হয়নি। অথচ গতিশীল সময়ের স্রোতে সেই সামাজিক বিবর্তনকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। তাহলে তার অনুবাদের আবেদন আন্তরিক হতে পারে না। সেই গতিশীল সময়ের ক্যানভাসে বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় আখতারুজ্জমান ইলিয়াসের(১৯৪৩-১৯৯৭) ‘চিলেকোঠার সেপাই’ (১৯৮৬) একটি অভিনব উপন্যাস। সেখানে ব্যক্তিমানসের উত্তরণের স্বরূপ যেমন উন্মোচিত হয়েছে, তেমনই সেইসঙ্গে সমাজমানসের বহুমাত্রিক বিবর্তনও অপূর্ব শিল্পসুষমা লাভ করেছে। ইতিপূর্বের উপন্যাসে যার অভাব স্বভাব হয়ে উঠেছিল, এই উপন্যাসে তাই নতুন করে ভাবনার খোরাক করে তোলে। বাংলা উপন্যাসের ধারায় উপন্যাসটির আবেদন তাই অভিনব সংযোজন হয়ে ওঠে। এজন্য প্রথমে উপন্যাসটির আবেদন সম্পর্কে আলোচনা করা জরুরি।

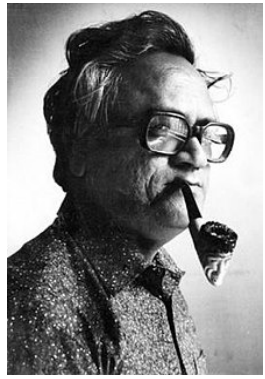

সাতচল্লিশের দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতায় দেশভাগের শিকার হয়ে ওপার বাংলার মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামী প্রয়াস নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলনের সাফল্য থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম তাই অপ্রত্যাশিত ছিল না। সময়ের সঙ্গে দমনপীড়ন যত বেড়েছে, ততই তার স্বাধীনতার দাবি মূর্ত হয়ে উঠেছে। আর তাই দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল সময়ের অপেক্ষা। পাকিস্তানের সামরিক শাসক আয়ুব খানের দশ বছরের (১৯৫৮-১৯৬৮) শাসনকালে পূর্ব পাকিস্তানে শোষণ-শাসনে ক্রমশ যত নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা নেমে আসে, ততই তার প্রতিবাদে স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবমুখী হয়ে থাকে। ১৯৬৬-র ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলের জাতীয় সম্মেলনে আওয়ামী লিগের জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবর রহমান যে 'ছয় দফা' দাবি পেশ করেন তার মধ্যেই ওপার বাংলার স্বাধীনতার স্বপ্ন জেগে ওঠে। কেন্দ্রীয় সরকারের আধিপত্যকে বিরত করে প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রস্তাব স্বাভাবিক ভাবেই পাকিস্তান সরকার নাকচ করে দেয়। অথচ সেই 'ছয় দফা'র মধ্যে যে স্বাধীনতার স্বপ্ন জেগে ছিল,তা শেখ মুজিবর কথাতেই আন্তরিক হয়ে ওঠে। তাঁর ভাষায় সেই দাবি ছিল, 'আমাদের বাঁচার দাবী'। সেই দাবির সমর্থনে পূর্ব পাকিস্তানে জনমত গড়ে তুলতে গিয়ে ১৯৬৬ থেকে শেখ মুজিব বছর দেড়েক কারাবন্দি থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আবার দাবি আদায়ে সক্রিয় হয়ে উঠলে ১৯৬৮-এর ৩ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে প্রচার লাভ করে। তাতে শেখ মুজিবসহ পয়ত্রিশ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সেই মামলার বিরুদ্ধে তীব্র জনমত গড়ে ওঠে ও প্রতিবাদী আন্দোলন সক্রিয়তা লাভ করে। ১৮ জানুয়ারি শেখ মুজিবর রহমান গ্রেফতার হলে ক্রমশ সেই আন্দোলন ওপার বাংলাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর মুক্তিকে কেন্দ্র করেই সেই আন্দোলন গণ-আন্দোলনের রূপ লাভ করে যা অচিরেই ১৯৬৯-র প্রথম থেকেই গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। সেবছরের সূচনায় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে'র 'এগারো দফা' দাবির মধ্যে পূর্বের 'ছয় দফা' তো ছিলই, সঙ্গে ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক ও রাজনৈতিক কর্মীর নানা দাবিদাওয়াও সংযুক্ত হয়। সেক্ষেত্রে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিবাদে ও শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিকে সামনে রেখে যে আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানজুড়ে ক্রমশ আমজনতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে,তা অচিরেই সরকারের নির্মম ও নিষ্ঠুর অমানবিক প্রতিরোধে আরও বেপরোয়া প্রকৃতি লাভ করে। তারই চূড়ান্ত পরিণতি গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রকট হয়ে ওঠে। শেষে পাকিস্তান সরকার বাধ্য হয়ে অনতিবিলম্বে শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয় এবং ১৯৬৯-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রেসকোর্সের ঐতিহাসিক ভাষণে তাঁর বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠার ইতিহাস রচিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিকামী আপামর জনসাধারণের উত্তাল গণআন্দোলনের আবহে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই'-এর সূচনা এবং গণঅভ্যুত্থানের ব্যর্থতার প্রবাহে তার সমাপ্তির মধ্যে সময়ের স্রোতকে অভিনব ভাবে অথচ বিশ্বস্ত করে তুলে ধরার প্রয়াসেই

উপন্যাসের আবেদন নিবিড় হয়ে ওঠে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সেই গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয় ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করলেও তা নিয়ে সাময়িক দূরত্ব বজায় রেখে তাঁর গভীর অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছেন। সেখানে তাঁর লক্ষ্যভেদী অর্জুনের দৃষ্টিতে উপন্যাসটি নিয়ে দীর্ঘকাল ভাবনাচিন্তা করতে হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৬৯-এর মার্চে লিটল ম্যাগাজিন 'আসন্ন'তে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠায়' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়। ১৯৭৫-এ দৈনিক 'সংবাদ'-এর সাহিত্যের পাতার 'চিলেকোঠায়' নামে উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে বেরোতে শুরু করে। আবার ১৯৮১-এর জানুয়ারিতে সাপ্তাহিক 'রোববার' পত্রিকায় উপন্যাসটি 'চিলেকোঠার সেপাই' নামে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়ে ১৯৮৩-এর জানুয়ারিতে তা শেষ হয়ে যায়। তারও বছরতিনেক পরে ১৯৮৬-তে উপন্যাসটি বই আকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত বলে পরিচিতি পেলেও সময়ের দিক থেকে উপন্যাসটির সূচনা হয়েছে ১৯৬৮-এর ডিসেম্বর থেকে। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই মাওপন্থী ন্যাপ-এর নেতা মৌলানা ভাসানীর আহবানের পূর্ব পাকিস্তানজুড়ে হরতাল প্রতিরোধে পাকিস্তান সরকারের পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার আকস্মিক উত্তেজনামুখর পরিসর বর্তমান। শুধু তাই নয়, উপন্যাসের আধারে বাঙালির অস্তিত্বের প্রবাহে অতীতে ফিরে দেখার অবকাশের মাধ্যমে স্বাভাবিক ভাবেই যোগসূত্রকে অবিচ্ছিন্ন করে তুলেছে। সেখানে উপন্যাসের সূচনা বাক্যেই তথা রহমতউল্লার চিলেকোঠাবাসী ওসমান্ গনির স্বপ্নদেখার শুরুতেই সাতচল্লিশের দেশভাগের ট্রাজিক পরিণতি ভেসে উঠেছে, 'তোমার রঞ্জু পড়ি রইলো বিভুঁয়ে, একবার চোখের দ্যাখাটাও দেখতি পাল্লে না গো !' শুধু তাই নয়, যেভাবে ঔপন্যাসিক মাসতিনেকের (১৯৬৮-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৯-এর ফেব্রুয়ারি) ঘটনাস্রোতের মধ্যে গণআন্দোলন থেকে গণঅভ্যুত্থানের পরিচয়কে নিবিড় করে তুলে ধরেছেন, তাতে স্বাভাবিক ভাবেই ফ্লাসব্যাকে ফিরে দেখার অবকাশে খণ্ডিত স্বাধীনতায় দেশভাগোত্তর পরিসরে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিজীবনের অসহনীয় দুরবস্থার কথা ফিরে ফিরে এসেছে। সেখানে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের দৃষ্টি শুধু সামনের দিকে এগিয়ে চলেনি, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি পিছনে ফিরে গিয়েছে। এই দেখা ও দেখানোয় ঔপন্যাসিকের অনন্যতাই উপন্যাসটির অভিনব প্রকাশে পালাবদলের আকাশ হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের ছকবন্দি ধারণায় আধুনিক মানুষের জীবনজিজ্ঞাসা যতই মূর্ত হয়ে উঠুক, তার বিনোদনী পাঠকে উপেক্ষা করা যায়নি। সেখানে ইতিহাসের চিত্তাকর্ষক কাহিনি ও তার বীরত্বব্যঞ্জক চরিত্রের পরিচয় থেকে অবৈধ প্রণয় সবেতেই সেই বিনোদনী পাঠ প্রকট হয়ে ওঠে। উনিশ শতকেই বাইরের জগৎ ছেড়ে যখন তার বিষয় মনের জগতে প্রবেশ করে,সেখানেও তার শিল্পরূপে উত্তরণের হাতছানি নানাভাবে মানসিক তৃপ্তির খোরাক হয়ে ওঠে। বিশ শতকেও সেই ধারা আরও পরিণতি লাভ করে। শুধু তাই নয়, তাতে মননবিশ্বই তার আশ্রয় হয়ে ওঠে। অথচ তাতেও তার শিল্পিত রূপে পরিশীলিত হাতছানিতে ইচ্ছে-অনিচ্ছের একমুখী চলনে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার অবকাশ বর্তমান। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিমানসের উত্তরণের প্রয়াস যেভাবে উপন্যাসের মধ্যে আলো হয়ে ওঠে, তেমনই তার ছায়ায় সমাজমানসের

পরিচয় আড়ালে চলে যায়। বাংলা উপন্যাসের মধ্যেই তার পরিচয় নিবিড় হয়ে ওঠে। তাতে উপন্যাসের সূচনাপর্ব থেকে সাধারণ মানুষের যোগ অত্যন্ত ক্ষীণ। উদ্দেশ্যমূলকতায় দৃষ্টিনিবদ্ধ করতে গিয়ে তার শিল্পরূপে সমাজমানসের খণ্ডিত চিত্রেই বাস্তবতার অপূর্ণ পরিচয় স্বাভাবিকতা লাভ করেছে। সামাজিক জীবনের চেয়ে দেশের ইতিহাসের চিত্তাকর্ষক ঘটনা, বীরত্বব্যঞ্জক ও মহিমান্বিত চরিত্রই সেখানে আবেদনক্ষম হয়ে উঠেছে। আসলে যেখানে সমাজের দাসত্বমুক্ত হয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতায় উত্তরণ প্রয়াসী মানুষের একে অপরকে জানার অবকাশে যে উপন্যাসের শিল্পরূপ আবেদনক্ষম হয়ে উঠেছিল, স্বাভাবিক ভাবেই তাতে

সমাজমানসের পরিচয়ে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গির রক্ষণশীলতা, সংস্কারাচ্ছন্নতা ও সীমাবদ্ধতা এবং একদেশদর্শিতা অত্যন্ত স্বাভাবিক। অন্যদিকে সমাজ ভেঙে নতুন সমাজ গড়ে তোলার ধারণাও সেক্ষেত্রে পরিপন্থী মনে হয়। অন্যদিকে মতাদর্শ ভিন্নতায় সেই সমাজের বাস্তব চিত্রও অধরা মাধুরী। সেদিক থেকে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে সমাজ পরিবর্তনের নিখুঁত বাস্তবায়ন দুর্লভ হয়ে ওঠে। গাছের মূল উপড়াতে গিয়ে তার কাণ্ড ধরে টানতে গিয়ে মূলই ছিঁড়ে যায়। তাতে গাছের অদেখা অংশ অজানা থাকে, মূলের ধারণাও অজ্ঞাত থেকে যায়। উপন্যাসের সমাজবাস্তবতাও সেভাবে মূলের পরিচয়ের অভাব নানাভাবেই অনুভূত হয়। বিশেষ করে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি উদাসীনতা বা উপেক্ষা স্বাভাবিকতা লাভ করে। অন্যদিকে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় উপন্যাসের মতো ব্যক্তিত্বের পরিচয়ও সুলভ নয়। আবার সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও ব্যক্তিসর্বস্ব হয়ে ওঠে। বাংলা উপন্যাসে সেই ব্যক্তিসর্বস্বতার অনুকরণও লক্ষণীয়। সেখানে সামাজিক মানুষের ব্যক্তিত্বের অভাব অত্যন্ত প্রকট। সেবিষয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস অত্যন্ত সচেতনই ছিলেন না, প্রকট ভাবে তা প্রকাশও করেছেন।

উপন্যাস বিষয়ে আখতারুজ্জামানের স্বচ্ছ ধারণাই তাঁকে গতানুগতিক উপন্যাস রচনা থেকে বিরত করেছিল। সেখানে 'চিলেকোঠার সেপাই'-এর বছরদশেক পরে তাঁর 'খোয়াবনামা'(১৯৯৬) উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় এবং আনন্দ পুরস্কার লাভ করে। 'লেখকের দায়'('আনন্দবাজার পত্রিকা', ২৮ এপ্রিল ১৯৯৬)) নিবন্ধে পুরস্কার প্রসঙ্গে তিনি সেকথাই স্মরণ করিয়ে লিখেছেন : 'আমাদের এই উপমহাদেশের ব্যক্তির বিকাশ প্রথম থেকেই বাধা পেয়ে এসেছে। এখানে ব্যক্তিপ্রবরটি জন্ম থেকেই পঙ্গু ও দুর্বল। পাশ্চাত্যের সর্বত্রই যেহেতু ব্যক্তিসর্বস্বতার জয়গান, আমাদের এখানেও তাই জন্মরোগা ব্যক্তিটির দিকেই আমাদের লেখকদের অকুণ্ঠ মনোযোগ। বাংলা উপন্যাসে প্রথমে এই রুগ্ন ব্যক্তির শরীরে একটু তেজ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই নকল তেজ তাকে শক্তি জোগাতে পারেনি। কেবল তা-ই নয়, বাংলা সাহিত্যের প্রথম সফল উপন্যাসগুলোয় বরং দেশের কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতাকে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের মর্যাদাই দেওয়া হয়। অথচ অন্যান্য সাহিত্যের উপন্যাসে তখন

প্রচলিত সংস্কার, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসকে অবিরাম আঘাত করা হয়েছে।' শুধু তাই নয়, বাংলা উপন্যাসে সেই 'জন্মরোগা ব্যক্তিটির' প্রতি সম্যক দৃষ্টি প্রদান করা জরুরির কথাও আখতারুজ্জামান স্পষ্ট ভাষায় তার অব্যবহিত অনুচ্ছেদেই জানিয়ে দিয়েছেন : 'ঔপনিবেশিক শক্তির উপহার এই খঞ্জ ব্যক্তিটিই হয়ে ওঠে লেখকদের আদরের ধন। তাকে নানা ভাবে তোয়াজ করাই আমাদের ঔপন্যাসিকদের আসল কাজ। দেশের অসংখ্য শ্রমজীবি মানুষের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ এবং আবার স্বপ্ন দেখার অসীম শক্তি আমাদের চোখে পড়ে না। এজন্য শ্রমজীবী, নিম্নবিত্ত মানুষকে নিয়ে যখন লিখি তখনও পাকেপ্রকারে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেই মধ্যবিত্তকে এবং শক্তসামর্থ্য, জীবন্ত মানুষগুলোকে পানসে ও রক্তশূন্য করে তৈরি করি।' সেক্ষেত্রে আখতারুজ্জামানের উপন্যাস ভাবনাই তাঁর উপন্যাসকে অভিনবত্বে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। তিনি বামপন্থী মনস্ক হলেও তাঁর মধ্যে মার্ক্সবাদী সাহিত্যাদর্শ সক্রিয় হয়ে ওঠেনি। সেখানেও তাঁর স্বীয় আদর্শ অবিচল ছিল। তার প্রতিফলন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চিলেকোঠার সেপাই'-এর মধ্যেই প্রতীয়মান। সেখানে তিনি আরোপিত সাহিত্যাদর্শকে সচেতন ভাবেই অস্বীকার করেছেন। সাক্ষাৎকারের (শাহাদুজ্জামান গৃহীত সাক্ষাৎকার চট্টগ্রামের 'লিরিক' পত্রিকায় বিশেষ উপন্যাস সংখ্যায়(এপ্রিল ১৯৯২) প্রকাশিত হয়।) মাধ্যমে সেকথা নানাভাবে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। Reality দেখাতে গিয়ে তিনি তার ভেতরটা দেখাতে চেয়েছেন। সেখানে Idea চাপাতে চাননি। তাঁর মতে সেটা হবে wrongful thinking সেক্ষেত্রে শ্রমিককে মহৎ বানালে তাকে disown ও Refuse করা হয় বলে তাঁর ধারণা। শুধু তাই নয়, সমাজকে দেখাতে গেলে তাঁর স্পষ্ট অভিমত, You must live in it. অন্যদিকে যৌনতা বিষয়েও তাঁর আত্মসচেতনতা অত্যন্ত সংবেদনশীল। তাঁর মতে, Sex নিয়ে সাহিত্য করা Risky। সেক্ষেত্রে Sex কে Glorify না করে তার পিছনে living-class কে, তার society দেখাতে চেয়েছেন তিনি। সেদিক থেকে আখতারুজ্জামানের স্বীয় সাহিত্যভাবনাই তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠি হয়ে উঠেছে।

সাহিত্যে বিষয়ের চেয়ে দেখানোর কৌশল অধিক গুরুত্ব পূর্ণ। কেননা দেখানোর মধ্যেই বিষয়ের বাস্তবতা বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করে, তার আবেদন গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে লেখকের দেখার আধারে দেখানোর অন্তর্দৃষ্টি নানাভাবে বিস্তার লাভ করে। ইতিহাসের প্রামাণ্য গণ্ডি অতিক্রম করে তার পরিসর লোকের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তি, রূপকথা, অলৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কার প্রভৃতিতে ছড়িয়ে পড়ে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস 'চিলেকোঠার সেপাই'-এ সেভাবেই অন্তেবাসী মানুষের আকাঁড়া জীবনকে তুলে ধরেছেন। তাতে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য মানুষের জীবনসংগ্রামকে তুচ্ছ করে দেখেননি, বরং সেই স্বাধীনতার পর দেশের আমজনতার শোষণ-শাসনের অপরিবর্তিত প্রকৃতির কথাও নানাভাবে তুলে ধরেছেন। সেখানে শহরের সঙ্গে শহরতলী, ঘিঞ্জি বস্তি থেকে গ্রামগঞ্জের আকাঁড়া জীবনসংগ্রামের বাস্তবচিত্র উঠে এসেছে। রুশবিপ্লবোত্তর পরিসরে বাংলা কবিতায় প্রেমেন্দ্র মিত্র যেভাবে 'প্রথমা' (১৯৩২) কাব্যের 'মানে' কবিতায় রক্ত-মাংস, হাড়-মেদ-মজ্জা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, লোভ-কাম-হিংসাসহ গোটা মানুষের মানে চেয়েছিলেন, 'চিলেকোঠার সেপাই'-এ সেভাবেই তার পরিচয়ের প্রয়াস বর্তমান। শ্রম-ঘাম-পুঁজ নিয়েই আখতারুজ্জামান তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোকে রূপদান করেছেন। সেখানে নায়কের

প্রাধান্য নেই, নেই ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতার ভাণ, রয়েছে জনগণের জীবনসংগ্রামের মধ্যে বেঁচে থাকার বিশ্বস্ত যাপনচিত্র, সহানুভূতির পরিবর্তে সমানুভূতির বৈষম্যহীনতা। অথচ তাতে নির্মোহ, নিরাসক্ত ও নিরাবেগ প্রকাশ। সেক্ষেত্রে ওপার বাংলায় সুদীর্ঘকাল পরে তথা ১৯৬২-তে শহীদুল্লাহ কায়সারের 'সারেং বৌ'-এর চব্বিশ বছর পরে 'চিলেকোঠার সেপাই'কে নিয়ে বিপুল উৎসাহ বা চর্চার নেপথ্যে শুধু তার অভিনব উপস্থাপনাকে চিহ্নিত করলে ভুল হবে। আসলে উপন্যাসটির মধ্যে পাঠক নিজেদের খুঁজে পেয়েছিল, সুধী সমাজও আত্মসমীক্ষার অবকাশে নতুন দিশায় জেগে উঠেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পূর্ব পাকিস্তানের শোষিত-শাসিত মুক্তিকামী বাঙালিমানসকে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে অসংখ্য উপন্যাস লেখা হয়েছিল। আবার ১৯৭১-এ স্বাধীন বাংলাদেশের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধই

অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, সে দেশের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের প্রবাহ সুদূর প্রসারী বিস্তার লাভ করে। হুমায়ূন আহমেদ, সেলিনা হোসেন প্রমুখের অসংখ্য উপন্যাসের পরিচয়েই তা প্রতীয়মান। আসলে সাফল্যে আবেগ ঘনিয়ে ওঠে, নতুন করে স্বপ্ন দেখার পথ প্রশস্ত হয়, গৌরববোধে ইতিহাসকে ফিরে দেখায় উদযাপনী প্রয়াস আন্তরিকতা লাভ করে। ব্যর্থতার ইতিহাস সেখানে ব্রাত্য হয়ে পড়ে, বিস্মরণের সদিচ্ছাই জেগে ওঠে। সেক্ষেত্রে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ব্যর্থতা অচিরেই ব্রাত্য হয়ে পড়ে। উপন্যাসের বিশ্বাসী মনোভাবের প্রকাশ সেখানে স্থির হতে পারে না, ব্যর্থতার করুণ পরিণতি বিমুখ করে তোলে। অথচ তা নিয়েও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' ওপার বাংলার উপন্যাসে তীব্র সাড়া জাগিয়ে তোলে।

আসলে উপন্যাসের প্রচলিত ছক ভেঙেই আখতারুজ্জামান স্বীয় লক্ষ্যে সফল হননি, দৃষ্টিভঙ্গির অনন্যতাই তাঁকে পাঠক ও সমালোচকের কাছে নিবিড় করে তুলেছে। সেক্ষেত্রে বৃহৎ পরিসরে(১৯৬৫-১৯৬৯) লেখা শওকত আলীর ত্রয়ী উপন্যাস 'দক্ষিণায়নের দিন', কুলায় কালস্রোত' ও 'পূর্বরাত্রি পূর্বদিন' তাঁর পূর্বে প্রকাশিত হলেও সেভাবে সাড়া ফেলেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সাপ্তাহিক বিচিত্রা'য় উপন্যাসগুলি যথাক্রমে ১৯৭৬, ১৯৭৭ এবং ১৯৭৮-এ প্রকাশিত হয়ে ১৯৮৫-তে তিনটি একসঙ্গে 'দক্ষিণায়নের দিন' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৮৬-তে ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার লাভ করে। সেখানে ষাটের দশকে দেশের মানুষের চিন্তাভাবনার পরিবর্তনে আলোড়িত সমাজের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। অথচ তার

পরের বছরে (১৯৮৬) 'চিলেকোঠার সেপাই'-এ সেই আলোড়িত সমাজের আশার আলোই নিস্তেজ হওয়ার ছবিতে পরিণত হয়। তারপরেও উপন্যাসটি নিয়ে বহুমাত্রিক চর্চার পরিসর গড়ে ওঠে। সেখানে গণঅভ্যুত্থানের ব্যর্থতা নয়, উপন্যাসে গণমানুষের নবপরিচয় ভাবিয়ে তোলে। এভাবে গ্রাম-শহরের গণজীবনের অপূর্ব সমন্বয় করে সমাজবাস্তবতার পরিচয় ইতিপূর্বে লক্ষ করা যায় না। সেদিক থেকে ওপার বাংলার উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের 'যথার্থ উত্তরসূরি আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। শুধু তাই নয়, তাঁর চেয়েও আখতারুজ্জামানের পরিসর বিস্তৃত, জটিল এবং সুগভীর উৎকর্ষমুখর ও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তার আকাঁড়া জীবনচিত্রে মানবিক আবেদন নানাভাবেই প্রকাশমুখর। সেখানে দেশবাসীর জীবনসংগ্রামের সঙ্গে দেশের মুক্তিসংগ্রাম কীভাবে নিবিড়তা লাভ করেছে, তার সুগভীর পরিচয় আন্তরিক হয়ে উঠেছে। অথচ তাতে ঔপন্যাসিকের দরদি মনের আবেগ নেই, দেশ ও দশের প্রতি স্বদেশপ্রেম জাগরণের দৃষ্টি আলো হয়ে ওঠেনি, বরং তাঁর অন্তর্দৃষ্টির গভীরতায় আঁতের কথায় নির্মম ও নিষ্ঠুর বাস্তবতায় জেগে ওঠা স্বপ্ন ভেঙে যায়, গড়ে তোলা বিশ্বাস নিস্তেজ হয়ে পড়ে। সেদিক থেকে 'লালসালু'র সুদীর্ঘ আটত্রিশ বছর পরে 'চিলেকোঠার সেপাই'-এর আগমন আবির্ভাব হয়ে ওঠে।

❁ — ❁ — ❁

নিগৃহিতা নারীপ্রগতি ও তার নগ্নায়ন : একটি মনস্তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা

ড. শুভেন্দু ঘোষ

আমরা জানি, শিল্প জীবনের নিহিত কার্যকারণের আবিষ্কার এবং শিল্পী মানব জীবনের রূপদ্রষ্টা দার্শনিক, তাই সাহিত্য ও শিল্পে যা কিছু উপস্থাপিত হয়, তা যদি জীবনের সমর্থনে না হয়, তাহলে তার কোনো জীবনমূল্য থাকে না। শিল্পী ও শিল্প উভয়েই স্বধর্মভ্রষ্ঠ হয়ে পড়ে। 'দ্রৌপদী' গল্পে মহাশ্বেতা দেবী ষোলোকলায় পূর্ণ একজন সম্মানীয়া নারীর অধিকার ও হৃদয়কে নিগ্রহ করে, তাকে ভাঙার কৌশলে নগ্ন করে উপস্থাপন করেছেন, এবং সারারাত ধরে তাকে ধারাবাহিক ধর্ষনের (ravishment) দৃশ্য দেখানোর মধ্য দিয়ে রসালো মাংস খিদেয় আক্রান্ত কিছু পুরুষের বিক্ষিপ্ত মানসিকতাকে (distracted mentality) তুলে ধরেছেন। কিন্তু কেন ? তিনি হয়তো বলবেন, ব্যক্তির সঙ্গে ভদ্রতার আবরণে লুকিয়ে থাকা রাষ্ট্রীয় চরিত্র (state of bliss) প্রকাশ করার জন্য। কিন্তু তার জন্য নারীকে বিবস্ত্রা করার কি প্রয়োজন ? কোনো পিতার সন্তান যদি ধর্ষক (rapist) হয়, তাতে তার পিতার কি দোষ ? এবং তার পিতৃত্বের diagnosis করে লাভ কী ? শিল্পের সম্মান রাখতে কোন রাজধর্ম পালন করলেন sub altern literature এর সুদক্ষা শিল্পী মহাশ্বেতা দেবী ? একজন নারী হয়ে আর একজন নারীকে লজ্জা ও সম্ভ্রমের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে, যে গঠনমূলক চিন্তাধারার পরিচয় তিনি দিলেন, তাতে এটা বলা যায় না কি, কথায় কথায় নারীকে নিগৃহীতা শুধু পুরুষ করে না, নারীও করে ? আসলে, সময়ের সঙ্গে যখন সমাজ বদলায়, তখন প্রেম ও প্রেমিক মানুষ বিভ্রান্ত হয় এবং জীবনতৃষ্ণা প্রেমতৃষ্ণা তখন দেহতৃষ্ণায় (body thirst) রূপান্তরিত হয়। এখানে হয়তো লেখিকা জীবনের

contradiction এর স্বাদ ও স্বাস্থ্য বদলে দিতে চেয়েছেন, ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সমতা বজায় রেখে, বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যতে, অনুসন্ধানী প্রয়াসে, সামাজিক ও ব্যক্তিগত মূল্যবোধের অবক্ষয়ে। যাদের শ্রদ্ধা নেই অতীতে, বিশ্বাস নেই ভবিষ্যতে, শুধু বর্তমানের গোলোক ধাঁধার ঘুরপাক থেকে মুক্তির সন্ধানী প্রয়াস খোঁজে এই তত্ত্বে- প্রেম ও ভালবাসার চরম আত্মসমর্পন দেহমিলনে (the traditional materials of love which releised from perverted sex)। তাই, যখন কোথাও কোনো মেয়ে গণধর্ষণের (gang rape) শিকার হয়, বা আত্মনিগৃহিতা (self-abuse) হয়, কিংবা অমানবিক এনকাউন্টারে মারা যায়, তখন এই নারকীয় ঘটনা সমকালের সাথে ভাবীকালকেও demarcated করে। এবং এর বর্ণনা যখন সাহিত্যে খুল্লমখুল্লা ভাবে হয়, তখন side effects হিসাবে এর ফোকাস এসে পড়ে আমাদের মনের দর্পণে, এবং respected relation গুলো ব্যক্তিগত উত্তেজনার আক্রোশে এসে পড়ে। ফলে, পিতাকন্যা, ভাইবোন ও মাসিবোনপোর সম্পর্কের সহমরণ ঘটে। অবদমিত কামনা (suppressed desire) রক্তের সম্পর্কে বিদ্রোহ করে intercourse relation- এ মাথা নত করে। তাহলে ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের systems কে প্রকাশ করার জন্য নারীকে নগ্ন করে, ধর্ষণের শারীরিক পদ্ধতি খুঁটিয়ে বর্ণনা করে লাভ কী ? এই আদিরসের বর্ণনা কি সুস্থ জীবনের পক্ষে মানানসই ? নারী প্রগতির স্বার্থে নারীর প্রেম প্রতীক্ষা ও পরিণতির এমন পরিণতি তাদের আত্মসম্মানে আঘাত করে না কী ? অবশ্যই করে। শালীনতা ও শিষ্টাচারের দফারফা হয়ে যায় এবং নারীর শক্তি স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের বারোটা বেজে যায়, একটা বিষাদীয় ও বিস্বাদীয় মানস যন্ত্রণার সুর আমাদের অন্তরকে পীড়িত করে। আমাদের humanitarian catastrophe প্রকাশ্য হয়ে পড়ে। ”

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় তাঁর গল্পে নারীপ্রগতির নগ্নায়ন নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করে সৃষ্টিকে উগ্র আধুনিকতার (ultra modern) জরায়ু পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারার বহুস্তরীয় ভাঁজে (in the multy-layered framework of psychological thought)। নারীর দেহমনের প্যাথোলজিক্যাল সার্ভে করে তাকে যমালয়ে রাত্রিযাপন (overnight stay in yamal) করিয়েছেন। নারীর আধ্যাত্মিক অঞ্চলের বিক্ষত যোনীরক্ত সভ্যতার মুখে তিনি লেপন করে দিয়েছেন অন্তহীন নিষ্ঠুরতায়। তাঁর 'বিজনের রক্তমাংস' গল্পে পুরুষের একাকীত্ব এবং নিঃসঙ্গতার তাৎপর্য ধরিয়ে দেওয়ার সূত্রে তিনি একজন পরিপূর্ণা নারীকে ব্যবহার করেছেন। গল্পের নায়ক বিজন নারীর ভালবাসা পায়নি, তাই সে তার বিক্ষিপ্ত মনের মানসিক শান্তি পেতে পতিতালয়ে (prostitution) রেণুর কাছে আসে। এবং রক্ত মাংসে থরবিন্যস্ত পা থেকে মাথা পর্যন্ত রেণুর নগ্ন দেহটাকে কল্পনা করে মনে মনে সুখ পায়, আর এতেই তার শারীরিক সিদ্ধিলাভ হয়। ফুসফুসের অসুখে আক্রান্ত বিজনের ভেঙে পড়া মানবিক সংযোগ জোড়া দিতে নারীদেহ ব্যবহারের কি অপূর্ব কৌশল,

তাই না ? নায়ক, থুরি মহানায়ক, ফের থুরি খলনায়ক, আবার থুরি পুরুষ নায়কের মন ভাল রাখতে নারী ও রমণীদের এহেন (filling power of emotions and education) আত্মকেন্দ্রিক উপস্থাপনা কোন শুভবুদ্ধির (good sense) জন্ম দেয় আমাদের মনে ? আসলে, সাহিত্য একটু খোলাখুলি না হলে পাঠক পড়তে চায় না, লেখক হতাশ হয়ে পড়েন। হতাশা কাটাতে লেখক তখন যুগের দাবীর দোহাই দিয়ে বিকৃত আধুনিকতার আমদানি করে থাকেন তাঁর লেখায়। তাই নারী প্রগতির সত্তা ও স্বার্থকে নিষ্পেষিত করে উপস্থাপন করতে হয়। এবং brain of deformed পুরুষের balance ধরে রাখতে একজন সুস্থ ও অভিজাত নারীকে ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। সনাতনী ভারতীয় সংস্কৃতিতে একে আমরা কি বলবো ? অতীত আদর্শের প্রতি আমাদের মুগ্ধতা ? না কি বর্তমান বাস্তবের প্রতি আমাদের দরদী হৃদয়ের স্বীকৃতির দ্বন্দ্ব ? আসলে, এটা এক ধরণের দ্বিচারিতা (duplicity) এবং রাজানক কুন্তকের বক্রোক্তিবাদের মতো প্রতিষ্ঠিত অর্থ থেকে সরে এসে স্বঘোষিত স্বার্থকেন্দ্রিক মতবাদের (self- proclaimed self- interested doctrine) প্রতিষ্ঠা। এর অবসান না হলে আগামীদিনে মেয়েরা ছেলেদের বিশ্বাস করবে কম, ভালবাসবে আরো কম, ভরসা করবে তার থেকেও কম। ”

জীবনমুখী সৃষ্টির নামে শিল্প সাহিত্যে এখন চলছে নারীদেহের চিত্রনাট্য অঙ্কনের মাধ্যমে মনুষ্যত্বকে বিকৃত করার আত্মঘাতী প্রতিযোগিতা (suicidal competition of humanity)। দেখবেন, এখনকার সাহিত্যে বাচ্ছা ছেলের সাথে কথোপকথনেও, তার মায়ের শরীরের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। লিখতে গিয়ে সবাই ভাবছেন বাজারে চলবে তো ? লেখকদের পুষ্টিহীন প্রতিভার (nutritious talent) এমন আপেক্ষিক ধারণাতেই এই পরিণতি। আসলে, মেয়েদের সাথে ওরাল সেক্স (when stimulate your partner's genitals with your mouth, lips or tongue) না করলে, বা তাদের আদুল দেহ না দেখলে, যাঁদের সাহিত্যভাব (literary thought) আসে না, তাঁরা বিজনদের মতো জনসংযোগহীন (poor public relations) অসুস্থ যৌনরোগী (patient in sexually transmitted diseases) ছাড়া আর কিছু নয়। একে আমরা প্রতিভার অভাব বলবো ? না, অভাবে আক্রান্ত প্রতিভা বলবো ? কোনটা ঠিক ? কে কাকে খুঁজছে- লেখক পাঠককে, না পাঠক লেখককে ? এক ধরণের লেখক আছেন, যাঁদের নাম আমরা জানি কিন্তু তাঁদের লেখা পড়ি না। আর এক শ্রেণির লেখক আছেন, তাঁদের নামও জানি, তাঁদের লেখাও পড়ি কিন্তু মনে রাখি না। অথচ এঁদের লেখা দাদা দিদিদের দয়া ও দৌলতে নানা পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়। আর যাঁদের লেখার গভীরতা ছুঁয়ে যায় আমাদের মন মেধা ও মননকে, তাঁদের ভাগ্যে সাহিত্যিক সম্মান জোটে না। তাই সাহিত্যিক নারায়ণ ভট্টাচার্য অনালোচিত থেকে যান, ‘The Autobiography of an unknown Indian’ গ্রন্থের রচয়িতা নীরদচন্দ্র চৌধুরীকে দেশান্তরিত হতে হয়। আর ’মেঘে ঢাকা তারা’ সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরু উপেক্ষিত রয়ে যান। ”

নগর যন্ত্রণায় আহত নাগরিক মনস্ক লেখক সন্দীপনের হাতে গড়া বিজন, সময়ের হাতে নিগৃহিত হয়ে নারী প্রগতির নামে তার দুর্গতি বাড়িয়ে নারীকে আত্মনিগৃহিতা করেছে। এবং অজগরের অক্টোপাশে জড়িয়ে তাকে হাজির করেছে বিকৃত কামনার কেন্দ্রবিন্দুতে (at the heart of perverse desire) সে তার disrespectful mind

এর ল্যাবরেটরীতে নারীর নরম দেহের sensitive sex organ (hottest erogenous zones) গুলোর chemical in balance করে বিশুদ্ধ ও বদ রক্তের ratio নির্ণয় করেছে। আধুনিকতার নামে তার এই আত্মধ্বংসী পরাজয় সভ্যতার সংকটকে note of interrogation এর সম্মুখে দাঁড় করিয়েছে। আজকের সমাজে সবার যদি বিজনের মনের অসুখ হয়, এবং তার নিরাময়ে মেয়েদের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তো মহাবিপদ, তাই না ? কেননা, এ দাবী মেটাতে মাংস খিদেয় লালায়িত পুরুষের (bulshing man) প্রেমে তখন, অমৃতের চেয়ে বিষের পরিমাণটা বেড়ে যাবে। ফলে, শুধু ভোগ হবে, সৃষ্টি হবে না। গর্ভপাত (abortion) হবে কিন্তু বৈধতার ছাড়পত্র পাবে না, এবং ডাক্তারী বিদ্যা (medical science) কোনো কাজে আসবে না। বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ির সংসারের ষষ্ঠীপুজো হয়ে যাবে। "

ঘামে রক্তে মাংসে গন্ধে ভরপুর এমন একটা পরিবর্তনের গল্প লিখে, তিনি পথ হারানো লেখকদের নতুন পথের সন্ধান দিয়ে, নিজেকে একালের প্রতিষ্ঠিত কথাকার হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। সে যাই হোক, আসলে নকলে কথাটা হল, মেয়েদের নিয়ে আদিরসের মাধ্যমে অশ্লীলতার (scurrility) চটচটে চাটনি চাটতে আমরা সকলেই কমবেশি অভ্যস্থ। উদাসীনতা (impassivity) আমাদের পাপবোধ (bad guilty conscience) থেকে মুক্তি পাওয়ার মানসিক সান্ত্বনা। লিখতে লিখতে লেখনীর দৈন্যতায় যখন আমাদের কলম থেমে যায়, কল্পনাশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, লোভ ক্ষমতা ও খ্যাতির চিটেগুড়ে আমাদের প্রতিভা আটকে যায়, এবং উৎকৃষ্ট মানের সাহিত্য সৃষ্টির প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ি, তখন হীনমন্যতা (inferiority complex) থেকে মুক্তি পেতে, সবচেয়ে সস্তা সেন্টিমেণ্ট যৌনতার আঁতুরঘরে ঢুকে লটরপটর করতে থাকি। কিন্তু, আমাদের এই রুগ্ন কল্পনায় নারীদেহের জলছবি আঁকার সিদ্ধান্তে নারীর সম্মতি আছে কি না, তা জানার চেষ্টা করি না। কেন করি না ? এই sting of the conscience question থেকে নিজেদের মুক্ত রেখে, সংক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগীর মতো (like a patient with an infectious disease) আমরা তাদের ancestral property মনে করি বলে। ভালবাসার ব্যর্থতাজনিত ব্যামো কাটাতে বিজন তার মনের বিষ মিশিয়ে দিতে চেয়েছে নারীদেহের সর্বাঙ্গে, গল্পের পালাবদলের প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে। 'চিলেকোঠার সেপাই' এর নির্মাণকর্তা আখতার উজ্জামান ইলিয়াসের মতো sex কে glorify না করে, living standard অর্থে class বা society কে দেখাতে চায় নি। তাই আলেকজাণ্ডার কুপ্রিনের 'Yama the pit' এর মতো dimension নেই এখানে। এবং এর উত্তরসূরী রূপে growth of orientation view নেই। " নারীর দিক থেকে পুরুষকে যদি এভাবে ব্যবহার করা যেত, তাহলে,

বিযে বিযে বিষক্ষয় হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকতো। কিন্তু মুশকিল হল, আমাদের দেশের জলহাওয়ায় পুরুষের দিক থেকে নারীকে ব্যবহার করে যে আনন্দ পাওয়া যায়, উল্টোভাবে নারীর দিক থেকে পুরুষকে ব্যবহার করে সে আনন্দ মেলে না। তাই, নির্বোধ পুরুষের প্রেমহীনতার এমন ফালতু ফিলোজফিক ধারণায়, একজন সমোত্ত নারী হয়ে ওঠে নিছক একটা আস্ত মেয়েছেলে। তাই আত্মপক্ষ সমর্থনে, অসংখ্য দহনের মধ্যমণি ও অবদমিত কামনার উৎসমুখ খুলে দেওয়ার কান্ডারী, চত-হতগবতত্ত্বের প্রবক্তা দার্শনিক ফ্রয়েডের ফাটাচটা ক্যাসেট বাজিয়ে সাহিত্যিক পুরুষ ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা সাহিত্যে যৌনতার পক্ষে মানবিক সমর্থন আদায়ের অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু, শুধু সাহিত্যের স্বার্থে সৌজন্যতার সর্বনাশ করে যৌনতার পক্ষে আত্মহননের এই ভাঁওতাবাজি যদি বন্ধ না হয়, তবে আগামী প্রজন্মের (next generation) কাছে, বা নিজেদের বিবেকের খাতায়, বা আগামী ইতিহাসের পাতায় আমরা sexually handicapped হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবো। সাহিত্য ও শিল্পের যৌন মনস্তত্ত্বের এই সাপলুডো খেলায় আমরা যতই জয়বাদ্য বাজাই না কেন, এর আসল রূপটা ধরা পড়ে মানুষের নৈতিক অধঃপতনে। তাই বর্তমান যান্ত্রিক জীবনের যন্ত্রনায় আহত ও অস্থির জন্মদাতা পিতা, পরিবারের মান বাঁচাতে নিজের সতেরো বছরের যুবতী মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করেন। বিপত্নীক বাবা তাঁর অভিশপ্ত মনের চাহিদা মেটাতে বিয়ের যোগ্য মেয়েকে নিয়মিত ভোগ করে যান। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো এটাও তো একটা মানবিক বিপর্যয়, তাই নয় কী ? আজকালকার সাহিত্যে বিবাহিত ও বিপত্নীক পুরুষদের মানবিক বিপর্যয়ের এমন ভুরি ভুরি চিত্র নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের মতো আমদানী হচ্ছে। কবিতা সিংহ, তিলোত্তমা মজুমদার প্রভৃতি সাহিত্যিকেরা যেভাবে রাগী যুবক যুবতীদের কামুকচিত্র আঁকছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে, মায়ের অবিবাহিত জীবনের বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে মেয়ের শারীরিক সম্পর্কের বাতাবরণ। বিমল কর এর 'যদুবংশ' র সূর্য তার ভাগ্নাকে বলছে- 'তোর মায়ের মাঞ্জা (belly button) যা আছে না, ঘুড়ি খচাখছ কাটবে'। আসলে আমাদের চলার পথের গতিবেগ যত বাড়ছে, রক্তের সম্পর্কের সংবেদনশীলতা ও স্পর্শকাতর মনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও উৎসাহ তত কমছে। ক্রমশ হতাশ ও নিরাশ হতে হতে আমরা আগিয়ে যাচ্ছি একটা সামাজিক পরিসমাপ্তির দিকে (towards a social end) আগিয়ে যাচ্ছে গোটা যুগ। এ যেন স্বার্থমগ্ন বিভেদ সর্বস্ব পৃথিবীর বুকে লেখকদের কল্যাণ ভাবনা ও আশাবাদের বাঞ্ছিত মিশনে তীব্র কুঠারাঘাত। শূন্যপুরাণে অহল্যার প্রতীক্ষা। বশীষ্টের মতো আত্মাহুতি দিয়েও বিশ্বামিত্রের গলায় উপবীত দেবার সংকল্প।

✿ — ✿ — ✿

জঙ্গলমহল

নলিনী বেরা

"শিমূল ফুলটি দেখতে ভালো
উপর লাল তার ভিতর কালো।
শিমূল ফুল জগৎ করে আলো
তবু তো ভ্রমর বসে না, -
আমি ঝুরি ওগো তোমার তরে
তুমি আমার পানে চাইলে না।।"

সুহ্ম-রাঢ় বা লাঢ়। ভবিষ্য পুরাণের ব্রহ্মখণ্ড অংশে 'রাঢ়ী খণ্ড জাঙ্গলভূমি' নামে এক দেশের কথা আছে। সেদেশ অজলা, ঊষর ও জঙ্গলময়। রাজা হরিবর্মদেবের মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট ও তাঁর একাদশ শতকের ভুবনেশ্বর শিলালিপিতে অনুরূপ এক দেশের কথা লিখেছেন, যার তিনভাগ জঙ্গল, একভাগ গ্রাম ও জনপদ। যা 'য়ুয়ান চোয়াঙ - রামচরিত - বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ প্রভৃতি কথিত' সেই 'কয়ঙ্গল-কজঙ্গল-কজাঙ্গল'। এখানেই 'আচারঙ্গ সুঙ্‌ত'-এর 'বজ্জভূমি' 'সুব্বভূমি'— উত্তর রাঢ়, দক্ষিণরাঢ়, প্রান্তরাঢ়। খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে মহাবীর এদেশে ধর্মপ্রচারে এলে তাঁর পেছনে "ছু-ছু" করে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল রাঢ়বাসীরা। রাঢ়দেশবাসী মুকুন্দরাম ও তাঁর 'ধর্মমঙ্গল'-এ লিখছেন, "কৃতাঞ্জলি বীর কহে হই গ চোয়াড়। লোকে না পরস করে সভে বলে রাড়।।" কালিদাসের 'রঘুবংশম্'-এও তো আছে, দিলীপপুত্র রঘু দিগ্বিজয়ে সুহ্মদেশে এলে সুহ্মদেশীয় রাজারা বেতগাছের মতো অবনত হয়ে তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন, রঘুও তাদের পদচ্যুত করে পুনরায় স্বপদে বসিয়ে দিয়েছিলেন। যেমনটা রোয়া ধান উপড়ে ফের রোপন করা আর কি! তারপর তো, "স তীর্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈর্বদ্ধদ্বিরদ-সেতুভিঃ। উৎকলাকর্শিত-পথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যযৌ।।" রঘু গজ-নির্মিত সেতুদ্বারা কপিশা নদী পেরিয়ে স-সৈন্যে হাজির হয়েছিলেন উৎকলে। কেউ বলেন 'কপিশা' সুবর্ণরেখাই, কেউ বলেন কাঁসাই। আর মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলছেন, রাঢ়-দেশই সুহ্ম-দেশে। অনেক পরে ষোড়শ শতকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত'-এ লিখছেন, "মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড, ভিল্লপ্রায় লোকসম পরম পাষণ্ড।।" মথুরা-বৃন্দাবন যাবার জন্য শিষ্যদের এড়িয়ে, মতান্তরে পাঠান সৈন্যদের চোখে ধুলো দিয়ে শ্রীচৈতন্য "প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা। কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা।। নির্জন বনে চলে প্রভু কৃষ্ণনাম লইঞা। হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুরে দেখিয়া।।" এ কোন্ নির্জন বন, 'জঙ্গল-মহাল', শ্রীচৈতন্য যার নাম বলছেন 'ঝারিখণ্ড' ? এই কি সেই 'রাঢ়ীখণ্ড-জাঙ্গল ভূমি' ?

যাকে মোগল আমলে মুসলিমরা নাম দিয়েছিলেন 'কোক্‌রা' বা 'ঝাড়খণ্ড', কর্কটরেখা বরাবর অবস্থান বলে বলা হচ্ছিল 'কর্কখণ্ড'ও। পুঁথি-পত্রে লেখা হয়েছিল শ্লোক, "অয়ঃ পাত্রে পয় পানম্‌। শালপত্রে চ ভোজনম্‌।। শয়নম খর্জুরী পত্রে। ঝাড়খণ্ডে বিধিয়তে।।" ? শালপাতার থালায় খাওয়া, মাটির পাত্রে জলপান করা, খেজুর পাতার চাটাইয়ে শোওয়া— এই ছিল ঝাড়খণ্ডী মানুষদের জন্য বিধান! তুর্কী-পাঠান, এমন কী গোটা মোগল যুগ ধরেই এই জঙ্গলাবৃত অঞ্চলকে বলা হত 'আঠার গড়জাত', 'কোক্‌রা' বা 'ঝাড়খণ্ড'। বাবরের কন্যা গুলবদনের লেখা 'হুমায়ুন নামা', 'জাহাঙ্গীরনামা'তেও ঝাড়খণ্ডের কথা আছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীই প্রথম ১৭৫৭ সালে বৃহত্তর জঙ্গল এলাকার নাম দিল 'জঙ্গল মহাল'। অবশ্য 'মহাল' শব্দটি মোগলদেরই। এক সময় তোডরমল্ল তৎকালীন উড়িষ্যাকে ৫টি সরকার ও ৯৯টি মহালে ভাগ করেছিলেন। আরও পরে, ১৮০৫ সালে লেপ্‌ন্যান্‌ ফার্গুসন 'জঙ্গলমহাল' দখল করলে মেদিনীপুর, মানভূম, বীরভূম, বর্ধমান আর বাঁকুড়ার কয়েকটি 'মহাল' নিয়ে তৈরি হল 'জঙ্গলমহল' জেলা। এই জেলার অস্তিত্ব বজায় ছিল ১৮৩৩ অব্দি। জনৈক সেটলমেন্ট অফিসার, বাবু রামপদ চ্যাটার্জী, তৎকালে লিখছেন— "The junjgle mahal covers a tract of country which in extent is about eighty miles in Length and sixty in breadth. On the east it is bounded by Midnapur, on the West by Singbhum and on the north by Panchet and on the South by Mayurbhanj. The soil is characterised as very rocky, country, mountaineous and everspread with Thick forests." আর আজ, 'জঙ্গলমহল' কোনও জেলা, বা তার চেহারা-চৌহদ্দি সুনির্দিষ্ট না হলেও মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূমের অরণ্য বেষ্টিত 'মহাল' মাত্রই 'জঙ্গলমহল'। "ডহর ডহর রে দাদা ডহর কত দূর। আমফুল জামফুল দেশ কত দূর।।"– আজও সে দেশ

অজলা, উষর ও জঙ্গলময়। আজও সে দেশে শাল, পিয়াশাল, ধ, আসন, কেঁদ্‌, কইম, ভেলা, বাদ-ভেলা, ভুড্‌রু, মহুল-কচড়া, করম, করঞ্জ গাছ দেখা যায়। ঝোপে ঝাড়ে আঁটারি-চুরচু-দুধিয়া-কুড়চি-বনপুঁই-বনকাল্লা-বনকুঁদরির 'ডগ্‌' মেলে। আজও সে দেশের জঙ্গলে, ডুব্‌কা-ডুংরিতে, খাম-আলু পান-আলু চুর্‌কা-আলু আঁউলা-বাঁউলা আলু-তুঙা পাওয়া যায়। বর্ষায় রদ্‌বদিয়ে ফুটে ওঠে-বালি-ছাতু, বড় বালি ছোট বালি, কুড়্‌কুড়িয়া, কাড়্‌হান, পরব ছাতু। শালগাছের ডালে ভাতের মতো সাদা সাদা ডিমওয়ালা লাল পিঁপড়ে এখনও 'পটম' বাঁধে, 'কুরকুট পটম্‌'। টাঁড়ে-টিকরে গাছে গাছে ফুড়ুং ফাড়াং করে উড়ে বেড়ায় কতরকম পাখি— 'ট্যাঁসা' 'ঢেপচু' 'ক্যার্‌কেটা' 'সিম্‌ফুচি' 'বুড়িমাউকাল' 'কয়ের' 'কপ্‌তি'! জঙ্গলে 'খেড়িয়া' 'বর্‌হা'

'ঝিঁকর' 'ল্যাক্‌ড়া' 'হুঁড়ার' 'রাম মাখা'- এখনও দু-চাট্টা দেখা যায়। "মানুষ জনম ঝিঙা ফুলের কলি রে। সাঁঝে ফুটে সকালে যায় ঝরি।।"— আজও সেদেশে কত মানুষ যে বাস করে! সাঁওতাল ভূঁইয়া ভূমিজ ঘেঁওরা বীরহড় মাহাত হাড়ি বাগদী ডোম মুচি লোধা মাহালী কাম্‌হার কুম্‌হার ঘাসী বাউড়ী শুঁড়ি তেলী তামলী খেড়িয়া ধোপা রাজু করণ সদ্‌গোপ বামুন কায়স্থ মাহিষ্য বৈশ্য ছুতার রাজওয়ার! এমন আরও যে কত! সে দেশে বার মাসে তের পরব। কখনও গ্রামের হরিমন্দিরকে ঘিরে সারা মাস জুড়ে চলে 'অষ্টমপ্রহর' 'চ ি বশ প্রহর' 'বেড়া-কীর্তন' বা 'নগর-কীর্তন'। ধর্মের গাড়ুতে 'বসুধারা'র জল ঝরে। "বরষিছে জলধারা রবি শশী তারা হারা শ্যাম-হারা যোগিনী পাগল গো।।" কী নেই ? 'রোহিণ' 'গাজন' 'আগুন-মাড়া' 'জিভ-ফোঁড়া' 'পিঠ-ফোঁড়া' 'ঝুলন' 'গমা' 'চিত' 'ইঁদ' 'পাতা-বিঁধার মেলা' 'করম' 'দাঁশাই' 'বাঁধনা' 'সহরায়' 'মকর' 'মকরযাত' 'বালি যাত' 'এরিকসিম' 'হারিয়ার সিম' 'দোল' 'সারহুল'। আছে ছো-নাচ' 'মহড়া-নাচ' 'পাঁতা-নাচ' 'কাঁঠি-নাচ' 'চাঙ্‌-নাচ' 'ঝুমুর' 'আহীরা' 'ভাদু' 'টুসু' 'উদয়া' 'ঢুয়া' 'রুমুজ' 'বেহা-গীত' 'কাঁদ্‌না-গীত' 'নাচ্‌নী-নাচ' 'সাখী-গান' 'দাঁড়-শালিয়া' 'পাঁতা-শালিয়া'। 'ঝিঁগা ফুল সারি সারি বঁধু বিনে রইতে নারি, আজ বঁধু র'হল কনখানে। সখি গ, আজ আমি র'হব কনখানে।" 'মারাং বুরু' 'গরাম' 'বড়াম' 'শীতলা' 'মনসা' 'ক্ষেত্রপাল' 'গরয়া' 'বাঘুৎ' 'সাত বউনি' 'দুয়ারসিনি'র 'থান' 'জাহের থান' তো প্রায় গাঁয়ে গাঁয়ে! সেদেশের মানুষ 'ঝাঁপানে' গলায় জ্যান্ত সাপ ঝুলিয়ে নদী থেকে মনসার 'বারি' তোলে, করম গাছের ডাল আঙ্‌নায় 'গেড়ে' তারা 'করম' করে, ভাদ্র মাসের একাদশীর সারারাত ধরে 'পাঁতা' নাচে, "আজরে ছানা-পোনারা বিরি-খিঁচুড়ি। কালরে ছানা-পোনারা দাঁত-গিজোড়ি।।" আবার মানভূমের পঞ্চকোটের রাজার মেয়ে ভদ্রেশ্বরী বা 'ভাদু' অল্প বয়সে মারা গেলে তার স্মৃতি রক্ষার্থে এই ভাদ্র মাসেই ভাদুকে নিজেদেরই ঘরের মেয়ে বানিয়ে সারা মাস ধরে 'ভাদু' গায়— "কাশীপুরের রাজার বিটি বাগদী ঘরে কি কর। হাতের জালি লয়ে কাঁখে মুখ সায়রে মাছ ধর।। মাছ ধরতে গেলে ভাদু ধানের গুছি ভাঙো না। একটি গুছি ভাঙলে পরে পাঁচশিকা জরিমানা।।" এই ভাদ্রমাসেই "ভুঙ্‌-চুঙ্‌-সারেঙা" করে বেজে ওঠে 'দাঁশাই' পরবের লাউয়ের খোল দিয়ে তৈরি বাদ্য যন্তর 'ভুয়াঙ'! কার্তিকের অমাবস্যায় এসে পড়ে 'বাঁধ না' বা 'হাতির লেকান সহরায়'। গরু-কাড়ার শিংয়ে তেল-সিঁদুর মাখিয়ে, গায়ে 'ফুঁক-নলি' দিয়ে নানা রঙের ছাপ-ছোপ এঁকে, গলায় গাঁদা ফুলের মালা ঝুলিয়ে, ধামসা-মাদল বাজিয়ে, মুখে "দি-ড়ি-দাঙ খে-টে-তাঙ" "দি-ক-ডো-দি-ধো খে-ল্‌ খে-ল্‌" আওয়াজ তুলে 'কুল্‌কুলি' মেরে তারা কাড়া 'খুঁটায়' গরু 'খুঁটায়'! পৌষ পরবে, বাঁউড়ির রাত্রি শেষে মকরে, টুসুর মূর্তি কী চৌদলা কাঁসাই, সুবর্ণরেখা, অজয়, দামোদর, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী, ময়ূরাক্ষী, কুমারী, ডুলুঙ, বরাকরের জলে ভাসিয়ে টুসুকেই তারা জিজ্ঞাসা করে, "জলে জলে যায়ো টুসু জলে তোমার কে আছে। মা-বাপ ছাড়া সবাই আছে গো জলে শ্বশুর ঘর আছে।।" আশ্চর্য! প্রাত্যহিক জীবনে

চোখের জল ফেলে রোদন করার কত শত উপকরণই না মজুত আছে! তবু তারা মেলা থেকে 'রোদন'-এর বই এনে 'কাঁদনা গীত' মুখস্থ করে— "উঠিলা সুয়ারি বসিলা নাহি মাগো। ঘুরি চাঁহিবাকু দিশিলা নাহি মাগো।।" মৃত স্বামীকে জড়িয়ে ধরেও মুখস্থ করা রোদন বলে, "এ কি থিলা মোর কপালে। মোক ছাড়ি তুমে চালি গলে।। মোকে নেই যাব তুলে বলি থিলে। কথা ত রাখলি নি কঁঠে চালি গলে।।" তাদের কত রকম ভাষা! সাঁওতালী, মুণ্ডারী, হো, ভূমিজ, কোড়া, মাহালী, সাঁদরি, কুড়মালী, কুরুখ, তোমালি, হাটুয়া, মাঝিয়া, দেড়গুজড়ি, কেরা-বাঙলা, আরও কত কি! তাবলে সে দেশের মানুষ কেবলই গান গায়, রোদন করে না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অপশাসনের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়ায়। কত বিদ্রোহ! 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' (১৭৬৩), 'চুয়াড় বিদ্রোহ' (১৭৭০), 'বগড়ীর নায়েক হাঙ্গামা' (১৮০৬), 'কোল বিদ্রোহ' (১৮৩১), 'গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামা' বা 'ভূমিজ বিদ্রোহ' (১৮৩২), 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' (১৮৫৫), 'সরদার আন্দোলন' (১৮৭০), 'মুণ্ডা বিদ্রোহ' (১৮৯০)। সর্বোপরি স্বাধীনতা আন্দোলন। "মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হল বলিদান - লেখা আছে অশ্রুজলে!" ক্ষুদিরাম বসু, মাতঙ্গিনী হাজরা, অনাথবন্ধু পাঁজা, অজয় মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আশুতোষ কুইলা, ঊর্মিলাবালা পারিয়া, কানাইলাল ভট্টাচার্য, কালীপদ মুখোপাধ্যায়, কুমারচন্দ্র জানা, কানু মাঝি, কুসুম বাগ্‌দী, গুণধর হাজরা, গোপিকাবিলাস সেন, চারুশীলা দেবী, দীনেশচন্দ্র গুপ্ত, দুকড়িবালা দেবী, দুর্জন সিং, দেবেন দাস, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, মহারাজ নন্দকুমার, নবজীবন ঘোষ (শালিখ), রাজা নরেন্দ্রলাল খান, পঞ্চানন পালিত, প্রদ্যোত কুমার ভট্টাচার্য, বংশীধর কর, বংশীধর বার, বনু রানা, বাবুলাল জানা, বিপিন বিহারী মণ্ডল, বিপ্রপ্রসাদ বেরা, বিভূতিভূষণ দাস, বিভূতিভূষণ সরকার, বিষ্ণুপ্রসাদ বেরা, বেহারীলাল করণ, বেহারীলাল হাজরা, বৈকুণ্ঠনাথ জানা, বৈকুণ্ঠনাথ দিন্দা, ভীমচরণ দাসমহাপাত্র, ভূতনাথ সাহু, ভূপাল পাণ্ডা, ভৈরব মাঝি, ভোলানাথ মাইতি, মহেশ্বর মাইতি, মানবেন্দ্রনাথ রায়, মুকুন্দ মাহাতো, মুরারী মোহন বেরা, মৃগেণ দত্ত মোহন মাহাতো, যুগলপদ দাস, যুধিষ্ঠির জানা, যোগেন্দ্র জানা, যোগেন্দ্র দাস, রক্ষণ বেরা, রজত দত্ত, রজনীকান্ত ঘোষ, রজনীকান্ত মাইতি, রমানাথ মাইতি, রাখালচন্দ্র সামন্ত, রাণী শিরোমণি, রাম পাড়ুই, রামচাঁদ সামন্ত, রামেশ্বর বেরা, শচীন্দ্রনাথ বারিক, শশীবালা দাসী, শশীভূষণ মান্না, শ্যামাচরণ দাস, শ্যামাচরণ মাইতি, শ্রীকান্ত মাইতি, সতীশ সামন্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সর্বেশ্বর সাঁতরা, সহদেব মাহাতো, সিধু মাঝি, সুরেন্দ্র ধাড়া, সুরেন্দ্রনাথ কর, সুশীল দাশগুপ্ত, সুশীল ধাড়া, হনুমানপ্রসাদ চৌধুরী, হরিচরণ বেরা, হরিচরণ দাস, হরিপদ মাইতি, হরেকৃষ্ণ জানা, হরেকৃষ্ণ যার। গোকুল মাহাত, গণেশ মাহাতো, মোহন মাহাতো, শীতল মাহাতো, সহদেব মাহাতো, কুশুয়াড়ি শবর, শুকদেব মাহাতো, চুনারাম মাহাতো, গোবিন্দ মাহাতো। এছাড়াও মেদিনীপুর পুরুলিয়া বাঁকুড়া বীরভূমের আরও যে কত মহাপ্রাণ স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল হয়েছেন- তাঁদের কথা যেন ভুলে না যাই। "বীরের এ অশ্রুধারা- এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা।"

❁ — ❁ — ❁

ভারতের স্বাধীনতা

অমল নাহা রায়

দেশের অভ্যন্তরে তখন চলছে রাজনৈতিক সংকট, অন্যদিকে শুরু হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। পঞ্জাব, বাংলা, আসাম, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল তখন ক্ষতবিক্ষত। ব্রিটেনও চাইছে সমস্যা না বাড়িয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে। এই অবস্থায় ১৯৪৭-এর ২০শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ক্লেমন্ট এটলি কমন্স সভায় ঘোষণা করেন যে, আগামী ৩০-শে জুনের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার দায়িত্বশীল ভারতীয় নেতৃবৃন্দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। যদি ইতিমধ্যে তাঁরা কোনো সর্বসম্মত সরকার গঠনে সক্ষম না হন, তাহলে ব্রিটিশ সরকার নিজের ইচ্ছামতো একটি কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রয়োজনে প্রাদেশিক সরকার গুলির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ফিরে আসবে দেশে।

১৯৪৭-এর ২২শে মার্চ নতুন বড়োলাট লর্ড লুই মাউন্ট ব্যাটেন ভারতে এলেন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য যত শীঘ্র সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তর করা। সারা ভারত তখন অগ্নিগর্ভ। তাঁর একান্ত সচিব জর্জ এবেল তাঁকে জানান যে, ভারতবর্ষ গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলেছে। লর্ড ইসমে বলেন, ভারত এখন মাঝ সমুদ্রে আগুন লাগা জাহাজ, যার নীচের খোল বারুদে ভর্তি। পঞ্জাবের গর্ভনর গ্ল্যানসির বক্তব্য, সারা দেশে সাম্প্রদায়িক হাওয়া বইছে। ২৪ শে মার্চ থেকে ৬-ই মে-র মধ্যে মাউন্টব্যাটেন বিভিন্ন ভারতীয় নেতা ও রাজন্য বর্গের সঙ্গে ১৩৩টি বৈঠক করেন। তাঁর লক্ষ্য অখন্ড ভারত, কিন্তু জিন্না তাঁর দাবিতে অনড়। গান্ধি ভারত-বিভাগের ঘোর বিরোধী। তিনি বড়োলাটকে বলেন যে, প্রয়োজনে জিন্নার হাতে সরকারের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হোক, কিন্তু ভারত-বিভাগ চলবে না। নেহেরু গান্ধির এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান। জিন্নার সঙ্গে কথা বলে বড়লাটের ধারণা হয় যে, ভারত-বিভাগ ছাড়া উপায় নেই। এই ব্যাপারে দেরি করার অর্থ, পঞ্জাব, বাংলা ও অন্যান্য জায়গায় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে, তা দীর্ঘস্থায়ী করে মানুষের জীবন ও সম্পত্তি বিনাশে সাহায্য করা। ক্রমবর্ধমান হিংসার চাপে নেহেরু, প্যাটেলরা দেশবিভাগ মানসিকভাবে মেনে নিতে বাধ্য হন।

ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদনের পর মাউন্টব্যাটেন ৩-রা জুন ভারত-বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। তাঁর পরিকল্পনা "মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব' নাম পরিচিত। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, সমগ্র ভারতকে, ভারত ও পাকিস্তান নামে দুই পৃথক ডোমিনিয়নে বিভক্ত করা হবে। দুই ডোমিনিয়ন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক বিষয় পরিচালনা করবে। মুসলিম প্রধান সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব বাংলা নিয়ে গঠিত হবে পাকিস্তান। পাঞ্জাব ও বাংলাকে বিভক্ত করা

হবে। এই দুই প্রদেশের কোন কোন অঞ্চল কোন ডোমিনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হবে, তা নির্ধারণের জন্য একটি সীমানা নির্ধারণ কমিশন গঠিত হবে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ও আসামের শ্রীহট্ট জেলা কোন ডোমিনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হবে তা গণভোট দ্বারা স্থির করা হবে। দেশীয় রাজ্যগুলি নিজ নিজ ডোমিনিয়নে যোগ দিতে পারবে। প্রত্যেক ডোমিনিয়নের আইনসভা তাদের সংবিধান রচনা করবে।

গান্ধিজি ভারতবিভাগের বিরোধী হলেও, দাঙ্গার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাবে সম্মত হন। ১৪ই জুন ওয়ার্কিং কমিটিতে দেশভাগের পক্ষে সওয়াল করেন। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে, কংগ্রেসের ভারত-বিভাগ সমর্থন বাস্তবসম্মত। ড. এস. আর মেহেরোত্রা বলেন, ভারত-বিভাগে সম্মত হয়ে কংগ্রেস অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকারক বিকল্পটি গ্রহণ করেছিল। তা না হলে, গৃহযুদ্ধ, নৈরাজ্য ও চরমতম বিশৃঙ্খলা ভারতকে গ্রাস করত। ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদও মনে করেন যে, গৃহযুদ্ধের চেয়ে দেশভাগ ভালো। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলেও জিন্না সম্পূর্ণ খুশি হতে পারেননি। কারণ তিনি সমগ্র বাংলা ও পাঞ্জাবকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। ঘোষিত পাকিস্তানকে "বিকলাঙ্গ ও কীটদগ্ধ' বলে আখ্যায়িত করেও, এই প্রস্তাব মেনে নেন।

১৯৪৭ সালের ৪-ঠা জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে "ভারতীয় স্বাধীনতা আইন' বিনা বাধায় পাস হয়। ১৮-ই জুলাই তা রাজকীয় সম্মতি লাভ করে। এই আইনের বলে ১৫-ই আগস্ট ভারত বিভক্ত হয় এবং ভারত ও পাকিস্তান ডোমিনিয়নের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব, পূর্ববাংলা ও আসামের শ্রীহট্ট জেলার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান। বাকি অংশ ভারতের। দেশীয় রাজ্যগুলিকে যে কোনো একটি ডোমিনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অধিকার দেওয়া হল। ১৯৪৭-এর ১১ ই আগস্ট জিন্না পাকিস্তানের গণপরিষদের সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৫-ই আগস্ট তিনি পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল এবং লিয়াকৎ আলি খান প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। ১৫ই আগস্ট মধ্যরাতে ভারতে প্রথম গর্ভনর জেনারেল হন মাউন্ট ব্যাটেন এবং প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন পন্ডিত জওহরলাল নেহরু। এক আবেগদীপ্ত ভাষণে তিনি বলেন, মধ্যরাতের ঘন্টা যখন বাজবে, সমগ্র বিশ্ব গভীর নিদ্রামগ্ন, তখন ভারত জেগে উঠবে জীবন ও স্বাধীনতার চেতনায়।

❁ — ❁ — ❁

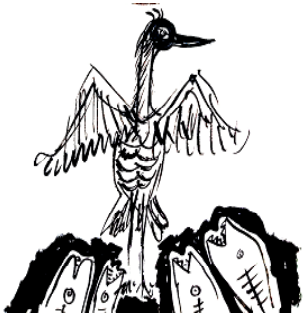

ভারতের স্বাধীনতা ও জঙ্গলমহল

অমর সাহা

কেউ বলেন জঙ্গলমহল, কেউ বলেন বনমহল। নামে কী এসে যায়। তবে এই জঙ্গলমহল বলতে বনচারী এলাকাকেই বোঝায়। বর্তমানে বেশ কিছু গবেষক নিম্নবর্গ ইতিহাসচর্চার ধারা প্রবর্তন করলেন। উদ্দেশ্য ভারতে চালু ইতিহাসবিদ্যার আদিকল্পের বিরুদ্ধে নতুন আদিকল্পের অনুসন্ধান করা। বীরভুমের রামপুরহাট মহকুমা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলেই নিম্নবর্গের কোল-ভীল-মুণ্ডা-সাঁওতাল এবং কুড়মি শ্রেণির মানুষের বসবাস। এই এলাকায় এসব শ্রেণির মানুষ যখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তখন উচ্চবর্ণের মানুষ তাদের সাদরে বরণ করেন।

জঙ্গলমহলের মানুষই প্রথম স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিল। সাঁওতালরা একজোট হয়ে রামপুরহাটের কাছে অবস্থিত দাম-ই-হিকো এলাকায় ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করে সেখান থেকেই সাঁওতাল বিদ্রোহের শুরু করেছিল। এর আগে মেদিনীপুর অঞ্চলের বাগদি-ঘড়ুই-খয়রা-মাঝি-চোয়াড় প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কৃষকদের সংগ্রামী ঐতিহ্য দীর্ঘকালীন। খয়রা ও মাঝিদের বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই দেখা দেয় চোয়াড় বিদ্রোহ। ইংরেজ শাসনের আগেই জঙ্গলমহল নামে একটি বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল মেদিনীপুর জেলার (ঝাড়গ্রামসহ) অন্তর্ভুক্ত ছিলো। পাইক সৈন্য তীর, টাঙ্গি, বর্শা, বাটুল প্রভৃতি নিয়ে যুদ্ধ করতো। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর খোঁজ করলে দেখা যাবে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনে সবার আগে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এইসব জনজাতির মানুষজন। মোগল আমল থেকেই এরা জমিদার তথা শোষকদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। ১৭৯৮-১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশে শুধু নয় বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলও চোয়াড় বিদ্রোহে সামিল হয়। শালবনি ছিল পাইকদের প্রধান বাসভূমি। ইংরেজ শাসকগণ সামরিক শক্তির সাহায্যে পাইকদের উচ্ছেদ করে তাদের জমি জায়গা কেড়ে নিয়েছিলেন। মেদিনীপুর শহর থেকে চোদ্দো মাইল দূরে অবস্থিত শালবনি ছিল পাইক প্রধান বাসভূমি। ইংরেজ শাসনে ভারতীয় সমাজে মহাজনী বাংলায় ঋণের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শোষণের ছবি নতুন রূপে লাভ করে। মধ্যস্বত্বভোগীদের জন্ম ঘটে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তারই ফল। এর ফলে জঙ্গলমহল এলাকায় নতুন করে নানাধরনের আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। তবে সাঁওতাল বিদ্রোহের আগে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে চোয়াড় বিদ্রোহ বোধহয় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম বিদ্রোহ যা জঙ্গলমহল এলাকার মানুষের বিদ্রোহ।

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী চোয়াড়দের জমি গ্রাস, জমিদারগণের রাজস্ব আদায়ের অক্ষমতা, রাজস্ব আদায়ের জন্য চোয়াড় অঞ্চলে সামরিক বাহিনী প্রেরণ, চোয়াড় ও জমিদারদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে ঘাটশিলার চোয়াড়দের বিদ্রোহ, ঘাটশিলার জমিদার ও চোয়াড়দের বিদ্রোহ, মেদিনীপুরের চোয়াড়দের বিদ্রোহ একসঙ্গে হয়েছিল (গেজেটিয়ার প্রণেতা ও ম্যালি কর্তৃক এর কারন ও ধ্বংসাত্মক রূপ বর্ণনা করা হয়েছে। কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণি পরবর্তীকালে পাইক ও চোয়াড়দের নিয়ে বিদ্রোহ করেছিলেন। পরবর্তীকালে বিদ্রোহ থেকে জমিদারদের বিচ্ছিন্ন করা ও চোয়াড় সর্দারগণকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করে বিদ্রোহ দমন করা হয়।

মহাবিদ্রোহ তথা সিপাই বিদ্রোহের আগে ১৮৫৫-৫৭ খ্রিস্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহ ভারতের সবচেয়ে বড় বিদ্রোহ। সাঁওতাল বিদ্রোহের পশ্চাতে ছিল জমির উপর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাঁওতালদের স্বাধীনতাস্পৃহা। যার ফলে তারা বনি তুলেছিলেন তাদের নিজ দলপতির অধীনে স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য চাই। বীরভূমের 'দামিন-ই-কো' অর্থাৎ সাঁওতাল পরগণার দুর্গম বন পরিস্কার করে এরা ঘর বাঁধে। প্রকৃতির সঙ্গে এদের অবিরাম সংগ্রাম। বনজ পশু বাঘ-ভালুকের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচা। সাঁওতাল কৃষকদের সেই হাসিল করা জমি ও মেহনতের ফসল কিছুকালের মধ্যে তাদের হাতছাড়া হতে থাকে। এর জন্য দায়ী জমিদার-মহাজন-ব্যাপারীদের অমানুষিক বর্বর সামন্তবাদী শোষণ। তাদের অর্থে পুষ্ট পুলিশের জুলুম ও পীড়ন থেকে রক্ষা করা আর বিদেশি শোষক শ্রেণির কোম্পানির সরকারের চরম প্রশাসনিক উদাসীনতা।

সাঁওতাল কৃষকেরা বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়েছি বাঁচার তাগিদে। বাঁচার জন্যই তাদের মূল দাবি জমি ও মুক্তি। নিরীহ, সরল, শান্তিপ্রিয় সাঁওতাল কৃষকেরা প্রথমে ছিল হিহিড়ি পিপিড়ি-তে। সেখানে জায়গা সংকুলান হওয়ার ফলে এরা শিলদায় আসে তারপর ছোটোনাগপুরে ছড়িয়ে পড়ে। সতেরো শতকে এরা বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে ঢোকে। সেখানে তারা জঙ্গল সাফ করে বসবাস করে। সেখানে জমির ষোলোআনা মালিক না হওয়াতে তাদের খাজনা দিতে হোত।

আঠারো শতকের শেষ ভাগে ও উনিশ শতকের প্রথমভাগে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, কটক, পুরুলিয়া, ছোটোনাগপুর, হাজারিবাগ প্রভৃতি অঞ্চলে সাঁওতালরা ৪২৭টি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৫০০টি। দামিন-ই-কোতে এসে চাষবাস করে সাঁওতালরা প্রথমে অনেকটা নিশ্চিন্তবোধ করেছিল। অনেক বাঙালি, ভোজপুরী, ভাটিয়া ব্যাপারী ও মহাজন দামিন-ই-কো এলাকায় কারবার শুরু করে।

সাঁওতালরা নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করে। এই

ভাষা প্রকৃতির দিক থেকে বাংলা বা হিন্দির সঙ্গে মেলে না। এই ভাষা ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের দিকে পরিবর্তিত হয়ে অলচিকি বর্ণমালা রচনা করে। এদের উপর জমিদার শ্রেণির মানুষদের শকুন দৃষ্টি পড়েছিল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে অনেক সাঁওতালকে জমি জায়গা ছেড়ে জঙ্গলে চলে যেতে হয়েছিল। অনেকে পেটের দায়ে মহাজনদের দাস হয়েই থাকতে বাধ্য হয়। সাঁওতাল কৃষকদের উপর যখন এই শোষণ ও পীড়ন চলছিল সেই সময় ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে সরকারি মুখপত্রেই স্বীকার করেছিল যে জমিদার, নায়েব, গোমস্তা, পেয়াদা, পুলিশ, আমলা এমনকি ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত সবাই মিলে নিরীহ গরিব সাঁওতাল চাষীদের উপর নির্মম অত্যাচার চালায়। এই সব ঠকবাজ অত্যাচারীদের নিষ্ঠুর পীড়ন থেকে রক্ষা পাবার জন্য আইন আদালত থেকে তারা কোনো সাহায্য পায়নি। সামান্য দেনার দায়ে, অন্যায় ও মিথ্যে সুদের দায়ে জঙ্গলের মুক্ত ও সরল এই মানুষগুলি মহাজনদের কাছে মাথা বিক্রি করে তাদের গোলামি করতে বাধ্য হয়েছিল। এর সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচার তাদের আরও সংঘবদ্ধ করে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসে কিংবা সুবোধ ঘোষের 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' গল্পে সেই শোষণ-পীড়নের ও তাদের সংস্কৃতির পরিচয় পায়। সাঁওতালরা গোপনে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করার পথ বেছে নেয়। কিন্তু পাকুর রাজের দেওয়ান জগবন্ধু রায় অসৎ ও শয়তান লোক ছিল। তিনি বীরসিংহকে জমিদারি কাছারি ডেকে এনে মোটা অঙ্কের জরিমানা করেন। টাকা দেবার ক্ষমতা না থাকার জন্য তার অনুগামীদের সামনেই দেওয়ান তাকে নিষ্ঠুরভাবে জুতোপেটা করেন।

এর পরেই ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের শুরুতেই বীরভূম! বাঁকুড়া, ছোটোনাগপুর, হাজারিবাগ থেকে ছ'সাত হাজার সাঁওতাল দামিন-ই-কো বা দামিন কোহে জমায়েত হয়। শোষণ, অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও অপমান সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের মনকে বিষাক্ত করেছিল। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুন রাতে ভাগনাডিহি গ্রামে ৪০০ গ্রামের প্রতিনিধি ও দশ হাজার সাঁওতাল কৃষকের বিরাট জমায়েত হলো। ভাগনাডিহির সভায় সিদ্ধান্ত ছিল বিদ্রোহের। এই বিদ্রোহে শুধু সাঁওতালরা নয় অ-সাঁওতাল বাঙালি, বিহারি, হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি গরিব কৃষকশ্রেণি ও কারিগররা যোগদান করে। —এরা হল কামার বা লোহার, তেলী, কুমোর, গোয়ালা, চামার, ভুঁইয়া, বাগদি, হাঁড়ি, ডোম প্রভৃতি জাতির মানুষেরা। মুসলমানদের মধ্যে ছিল মেমিনরা। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের শেষ ভাগে জামতাড়া এলাকা থেকে কানুকে ধরা হয়। সিধু ও কানুর নেতৃত্বে এই আন্দোলন চলছিল। জেনারেল লয়েড ও জেনারেল কর্ডের নেতৃত্বে চোদ্দো হাজার সৈন্য সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনে কাজ করেছিল। কম করে দশ হাজার সাঁওতালকে মেরে ফেলা হয়েছিল। দীর্ঘ আট দশমাস ধরে ইংরেজ কোম্পানী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈন্য দিয়ে সাঁওতাল কৃষকদের গণহত্যা ও তাদের ঘরগুলি জ্বালিয়ে দেওয়ায় এই বিদ্রোহ ধীরে ধীরে থেমে যায়। বন্দি হিসেবে ২৫১ জনের মধ্যে তিন জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকি ২৪৮ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে। এদের মধ্যে ৪৬ জন ছিল ৯-১০ বছরের বালক। তাদের বেত মেরে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকি সকলকে চোদ্দো বছরের মিয়াদে সাজা দেওয়াহয়।

সাঁওতাল বিদ্রোহ ভারতের গণ আন্দোলনের প্রথম প্রদর্শক। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়নি। এই বিদ্রোহে ৩০ থেকে ৫০ হাজার সাঁওতাল যোগদান করেছিল। এই সংগ্রাম

বাংলা তথা ভারতের কৃষক সংগ্রামের ঐতিহ্যকে আরও উজ্জ্বল ও গৌরবমণ্ডিত করে। সাঁওতালদের বিদ্রোহকে অনুসরণ করে পরে নীলদ্রোহ (১৮৬০-১৮৬১), পাবনা ও বগুড়া(বাংলাদেশ), রায়ত অভ্যুত্থান(১৮৭২), দাক্ষিণাত্যে মারাঠা কৃষকদের অভ্যুত্থান (১৮৭৫-১৮৭৬), বাংলার তেভাগা আন্দোলন(১৯৪৬-৪৭) গড়ে উঠেছিল।

স্বাধীন ভারতে ঝাড়খণ্ডী আন্দোলন সাঁওতালদের জন্য। গত শতকের আটের দশকে ঝাড়খণ্ডী আন্দোলন সাঁওতাল সম্প্রদায়ের স্বাধীনতার জন্য, নিজস্ব রাজ্য গঠন ও কর্মক্ষেত্রে তাদের তপশিলি নিয়ম অনুসারে উপস্থিতির জন্যই ঝাড়খণ্ড আন্দোলন। তাছাড়া কেন্দুপাতা নিয়ে মহাজনদের মুনাফা লুটে নেওয়ার বিরুদ্ধে ঝাড়খণ্ডী আন্দোলন। আর একুশ শতকে মাওবাদী আন্দোলন স্বাধীন ভারতে এখন আমাদের মনে পড়ে যায়। সেই বিদ্রোহে অনেক মানুষকে গৃহছাড়া, বাস্তুছাড়া হতে হয়েছে। অনেকের স্ত্রী বিধবা হয়েছে। অনেকের মা সন্তান হারিয়েছে। মহাজনদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আরণ্যক সমাজ বহুভাবে অবহেলিত ও অত্যাচারিত।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:—
১. সুপ্রকাশ রায়, 'ভারতের কৃষি আন্দোলন ও অন্যান্য বিপ্লব'।

❁ — ❁ — ❁

স্বাধীনতা সংগ্রামে জঙ্গলমহল ঝাড়গ্রাম

ড. মধুপ দে

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুটি ধারা - অহিংস গণআন্দোলনের ধারা এবং সহিংস সশস্ত্র বিপ্লবের ধারা। বঙ্গদেশের সঙ্গে মেদিনীপুরেও দুটি ধারাই বিকশিত হয়েছিল। কলকাতার 'অনুশীলন সমিতি' এবং মেদিনীপুরের "আনন্দমঠ" প্রায় একই সময়ে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় স্থাপিত হলেও মেদিনীপুরে এর গোড়াপত্তন ঘটেছিল অনেক আগে অষ্টাদশ শতকে ১৭৬৭ সাল থেকে। ১৭৬৭ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত সংঘটিত মেদিনীপুরের পশ্চিমাঞ্চল তথা জঙ্গলমহলের রাজা-প্রজা-নিম্নবর্গীয় সাধারণ মানুষের সেই সংগ্রাম ইতিহাসে উপেক্ষিত থাকলেও এবং তাকে 'চুয়াড় বিদ্রোহ' নাম দিয়ে তাচ্ছিল্য করলেও, সেটাই ছিল ব্রিটিশ ভারতের প্রথম ইংরেজ বিরোধী সংগ্রাম।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার পুতুল নবাব মিরকাশিমের কাছ থেকে মেদিনীপুর চাকলা, বর্ধমান চাকলা এবং চট্টগ্রাম প্রদেশ উপহার পেয়েছিল ১৭৬০ সালে। ১৭৬৫ সালে তারা দিল্লির বাদশাহ শাহ আলমের কাছ থেকে দেওয়ানি সনদ পেল। ১৭৬৬ সালে তারা মেদিনীপুরের রাজা-রাজড়া -জমিদারদের কাছ থেকে খাজনা দাবি করল। কিন্তু, মেদিনীপুরের উত্তর-পশ্চিমের গোটা জঙ্গলমহল জুড়ে কোনো রাজা-রাজড়া-জমিদার খাজনা না দেওয়ায় তাদের পদানত করার জন্য ইংরেজরা ১৭৬৭ সালে সেনা অভিযান করে। তখনও আমাদের দেশে স্বদেশ চেতনা" ধারণা সৃষ্টি হয়নি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আগে জন্মভূমি বা দেশ নিয়ে তেমন কোনো আবেগ তৈরি হয়নি। রাজত্ব এবং কর্তৃত্ব থাকলেই জঙ্গলমহলের রাজারা খুশি। কিন্তু, রাজা ভিন্ন

অন্য কারও কর্তৃত মানা প্রজাদের স্বভাবে ছিল না। সর্বোপরি জঙ্গলমহলের রাজারা একাবদ্ধ ছিলেন না।

ফলে ইংরেজরা ১৭৬৭ সালে জঙ্গলমহলে সেনা অভিযান করলে কোনো কোনো রাজা-জমিদার বশ্যতা স্বীকার করলেন, আবার কেউ কেউ রুখে দাঁড়ালেন। কিন্তু, কোনো রাজ্যের প্রজাই রাজা ভিন্ন অন্য কারও কাছে মাথা নত করতে চায় না। ইতিমধ্যে ইংরেজরা জঙ্গলমহলের সনাতন প্রথায় আঘাত হানল। তখন জঙ্গলমহলের রাজারা রাজ্য রক্ষা, রাজ্যশাসন এবং লুঠতরাজের জন্য পাইক সৈন্য পুষতেন। রাজহড়, মাঝি, বাগদি, বাউরি, কুড়মি, লোধা-শবর, খেড়িয়া-শবর, মুণ্ডা, ভূমিজ, সাঁওতাল, বাগাল, মাল প্রভৃতি জঙ্গলমহলের নিচু জাতের শক্ত সমর্থ যুবকদের পাইক হিসেবে নিযুক্ত করা হতো। পাইকরা জঙ্গলমহলের মিলিটারি শক্তি। এই পাইকরা বেতনের পরিবর্তে নিষ্কর পাইকান জমি ভোগ করত। এরা তির-ধনুক, ঢাল-তলোয়ার, টাঙ্গি, বর্শা, পাকানো লাঠি নিয়ে রাজার আদেশ পালনের জন্য সবসময়ে প্রস্তুত থাকত। ইংরেজরা রাজস্ব আদায় করতে এলে এই পাইক সৈন্যরা তাদের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। বিশেষত, যে সব রাজারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল, পাইকরা নির্বিচারে তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে গ্যারিলা যুদ্ধে ইংরেজদের নাস্তানাবুদ করতে লাগল।

কোম্পানি পাইকদের শায়েস্তা করতে নিষ্কর পাইকান জমিতে খাজনা বসিয়ে দিল। ফলে সমস্ত পাইক সৈন্যরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। আর পাইকদের পাশে এসে দাঁড়াল তাদের প্রতিবেশি এবং আপনার জন নিম্নবর্গীয় জংলি জাতি এবং জনজাতির মানুষজন। রাজা-জমিদাররা গোপনে তাদের সব ধরনের সাহায্য করতে লাগলেন। ফলে ১৭৬৭ সাল থেকে ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত দফায় দফায় জঙ্গলমহলের পাইক সৈন্য এবং নিম্নবর্গীয় জনসম্প্রদায় ইংরেজ কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গ্যারিলা যুদ্ধ করেছিলেন। রাজা-জমিদাররা গোপনে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। রাজহড়, মাঝি, বাগদি, বাউরি, কুড়মি, লোধা-শবর, খেড়িয়া-শবর, মুন্ডা, ভূমিজ, সাঁওতাল, বাগাল, মাল প্রভৃতি জঙ্গলমহলের জনজাতি সম্প্রদায় এবং তথাকথিত নিম্নবর্গীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন পাইক সৈন্যদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের তির, ধনুক, তলোয়ার, ঢাল, টাঙ্গি, বর্শা, লাঠি নিয়ে

ইংরেজদের বিরুদ্ধে গ্যারিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। প্রথম পর্যায়ে (১৭৬৭ সাল থেকে ১৭৬৯ সাল) এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ধলভূমগড় বা ঘাটশিলার রাজা জগন্নাথ ধল। দ্বিতীয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে (১৭৯৮ সাল থেকে ১৭৯৯ সাল) এই বিদ্রোহের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কর্ণগড়ের রানি শিরোমণি। মাঝের বছরগুলোতেও লড়াই জারি ছিল, কিন্তু তার প্রাবল্য ছিল কম। এই ৩৩ বছর ধরে সংঘটিত ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে বিভিন্ন স্থানের লড়াইতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শিলদার জমিদার মানগোবিন্দ, বামনঘাটির পাইক সর্দার সুবলা সিং, দামপাড়ার সর্দার জগনাথ পাতর,

বগড়ির বাগদি নেতা গোবর্ধন দিগপতি, রায়পুরের জমিদার দুর্জন সিং। আর সবার উপরে মূল নেতৃত্বে ছিলেন মেদিনীপুর জমিদারির রানি শিরোমণি। ইংরেজরা বাধ্য হয়ে রাজদ্রোহিতার অপরাধে ১৭৯৯ সালের ৬ এপ্রিল রানি শিরোমণিকে বন্দী করতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশ ভারতের প্রথম রাজনৈতিক বন্দিনী হলেন রানি শিরোমণি। দুঃখের বিষয়, এই ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে বহু আদিবাসী জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করলেও, তাঁদের নাম-ধাম প্রকৃত তথ্য এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ইংরেজরা এই যুদ্ধকে খাটো করার করার জন্য একে চুয়াড় বিদ্রোহ নাম দিলেও এটাই ছিল দেশীয় মানুষের প্রথম সশস্ত্র ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন।

এর পরে ১৮০৬ সাল থেকে ১৮১৬ সাল পর্যন্ত মেদিনীপুরের বগড়িতে (গড়বেতা থানা) অচল সিংয়ের নেতৃত্বে সংঘটিত হয় দ্বিতীয় সশস্ত্র ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন, যা ইতিহাসে 'নায়েক বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। এবারেও এই বিদ্রোহী নায়েকরা ইংরেজদের অধীনতা অস্বীকার করে গ্যারিলা পদ্ধতিতে লড়াই করে ইংরেজদের রাজস্ব আদায় শূন্যে পরিণত করে। কিন্তু, বগড়ির রাজা ছত্র সিংহ বিশ্বাসঘাতকতা করে অচল সিংকে ইংরেজদের হাতে ধরিয়ে দেওয়ায় এই আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। বিচারে ইংরেজরা অচল সিংকে ফাঁসি দিয়েছিল। এটাই মেদিনীপুরের প্রথম পর্যায়ের সশস্ত ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের শেষ পর্যায়।

এর পরে সিপাহি বিদ্রোহের ঢেউ (১৮৫৭ সাল) মেদিনীপুর শহরে পড়লেও তা উল্লেখ করার মত নয়। মেদিনীপুর শহরে শেকাওয়াতি ব্যাটেলিয়ান নামে একটি রাজপুত সিপাহিদের পল্টন ছিল। এই পল্টনের অধিনায়ক ছিলেন কর্নেল ফস্টার। সিপাহি বিদ্রোহের সময়ে এই পল্টনের জনৈক তেওয়ারি ব্রাহ্মণ-সিপাহি অন্যান্য সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহের প্ররোচনা দিচ্ছিলেন। কর্নেল তা বুঝতে পেরে এ সিপাহিকে বন্দী করে ওই কেল্লার মাঠেই ফাঁসি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

বঙ্গভূমিতে প্রকৃত স্বদেশ চেতনার জন্ম বিংশ শতাব্দীতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এর পূর্বে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মধ্যযুগের মুসলিম আগ্রাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু বীরের বীরত্বপূর্ণ সংগামকে দেশভক্তির নিদর্শন মনে করা হয়েছিল। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ,'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এ "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাচিতে চায় হে" বা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত সঙ্গীত'-এ "বাজরে সিঙ্গা বাজ" এই রবে প্রভৃতি দেশভক্তির গান দিয়ে জাতীয়তাবোধের একটা অস্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়েছিল। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ" উপন্যাসে তারই চুড়ান্ত রূপ দেখা যায়। বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্রের অনবদ্য ব্যবহারে তাঁর ১৮৭০ সালে রচিত "বন্দেমাতরম' কবিতা জন্মভূমি দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করা সম্ভব হয়। ১৮৯৬ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কবিতাটি প্রথম গেয়েছিলেন। কিন্তু, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন থেকেই শুরু হল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলন। ব্রিটিশ ভারতে কংগ্রেস দলের সৃষ্টি যে কারণেই হোক না কেন বিংশ শতাব্দীতে জাতীয় কংগ্রেস এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল সমার্থক। কংগ্রেস কর্মী হওয়া মানেই স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে পুলিশের খাতায় নাম উঠে যেত। সেই সময়ে যাঁরা কংগ্রেস দলে নেতৃত্ব দিতেন বা সদস্য হতেন তাঁরা জেনেশুনেই ব্রিটিশ বিরোধিতায় নিজেদের যুক্ত করতেন। ঝাড়গ্রামে স্বাধীনতা সংগ্রামের তথ্য খুব বেশি সংগৃহীত হয়নি। কারণ,

গভীর জঙ্গলে ঢাকা ঝাড়গ্রামের ইতিহাস জানা বা লিখে রাখার কথা কেউ ভাবেননি।

কিন্তু, ঝাড়গ্রাম যে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে নীরব দর্শক ছিল না, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন মেদিনীপুর জেলার 'কালো ষাঁড়' নামে খ্যাত উন্নতশির বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী অন্যতম প্রধান মুখ এবং জেলার অসহযোগ আন্দোলনের নেতা। ১৯২২ সালে গিধনিতে সেই বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে বিরাট সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। এই সভায় প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ জমায়েত হয়েছিল। অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল। প্রজাদের উপরে মেদিনীপুর জমিদার কোম্পানির নিপীড়নের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল তাতে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য চন্দ্রমোহন রাণা, গোবিন্দপ্রসাদ অধিকারী প্রমুখ স্থানীয় নেতাদেরও এই অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এই কাজের প্রধান হোতা ছিলেন মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার সুপরিচিত কংগ্রেস নেতা শৈলজানন্দ সেন। তিনি ছিলেন গিধনির অধিবাসী। গিধনিতে কংগ্রেসের সেই সাংগঠনিক শক্তি ছিল বলেই তাঁর নেতৃতে স্থানীয় জনসাধারণ ব্রিটিশ বিরোধী নেতা বীরেন্দরনাথ শাসমলকে সংবর্ধনা দিতে পেরেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামী লেখক বসন্তকুমার দাস তার 'স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর' গ্রন্থে বলেছেন,

"অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২১) প্রবল তরঙ্গে মেদিনীপুর জেলাতে যে বিপুল জাগৃতির সৃষ্টি করেছিল, ১৯২২ সালে সৃষ্ট ঝাড়গ্রাম মহকুমাতে তার সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ১৯২২ সালে যে মহকুমা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়, তার সভাপতি নিবাচিত হন দীনেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়। রগড়া নিবাসী গদাধর মণ্ডল মহাশয় এর অন্যতম সদস্য ছিলেন। ইনি মহকুমা আদালতের একজন আইন ব্যবসায়ী (মোক্তার) ছিলেন। সমাজসেবী হিসাবে এঁর যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রভাব হিল। অবিনাশচন্দ্র সেনগুপ্ত, তারাপদ দে প্রমুখ প্রধান ব্যক্তিগণ সকলেই কংগ্রেসসেবী হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন" (বসন্তকুমার দাস : স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর ২য় খণ্ড পৃ. ১৮৬)

১৯২২ সালে জমিদাররা সকলে একজোট হয়ে সেটলমেন্টেরস্বত্বলিপিতে সেচকর, পথকর, খাদকর, কাঁটাকর ও পাতাকর, এই পাঁচ প্রকার কর বাবদ টাকা প্রতি এক পয়সা অতিরিক্ত কর আদায়ের কথা ঘোষণা করেন। কংগ্রেস নেতা শৈলজানন্দের নেতৃত্বে ঝাড়গ্রাম মহকুমার জনসাধারণ এই অতিরিক্ত করের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এই কাজে যোগ্য সঙ্গত দিয়েছিলেন ঝাড়গ্রাম মহকুমার

সুন্দর নারায়ণ মাহাতো, হরমোহন মাহাতো, রমানাথ মাহাতো, উপেন্দ্রনাথ মাহাতো, কুল মাহাতো, রাজীব মাহাতো, শিমুল সাঁওতাল, টুনিয়া মান্ডি, তারাপদ দে, জাহ্নবী চ্যাটাজী, রমানাথ দত্ত, দর্পনারায়ণ বেরা, রাধানাথ বেরা, উপেন্দ্রনাথ বেরা, চন্দ্রমোহন রানা, যুগলকিশোর রানা, যতীন্দ্রনাথ দণ্ডপাট প্রমুখ কংগ্রেস কর্মীরা। বসন্তকুমার দাস মহাশয় বলেছেন প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা মহেন্দ্রনাথ মাহাতো এবং সাতকড়ি রায় এই আন্দোলনকে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। এর জন্য শিলদা পরগনার মাহাতো

এবং সাঁওতাল অধিবাসীবৃন্দ কংগ্রেসনেতা এবং হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট সাতকড়িপতি রায়কে মানপত্র দিয়ে অভিনন্দিত করে।

তাছাড়া, লালগড়ের জমিদার যোগেন্দ্রনারায়ণ সাহসরায় এবং বেলিয়াবেড়ার প্রহরাজ কৃষ্ণচন্দ্র দাসমহাপাত্র নানাভাবে অর্থ সাহায্য দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহায্য করতেন। ১৯২৪ সালে তৎকালীন গোপীবল্লভপুর থানার বেলিয়াবেড়া গ্রামের গোপীনাথ পতি মেদিনীপুর শহরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল হিসেবে এসেছিলেন ব্যবসা করতে, কিন্তু এখানে এসে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের অনুপ্রেরণায় তিনি কংগ্রেস দলের সদস্য হন। তিনি লোকাল বোর্ডের নির্বাচনে গোপীবল্লভপুর থানার কংগ্রেস প্রার্থীরূপে ইংরেজদের সমর্থিত ময়ূরভঞ্জরাজার ক্ষমতাশালী ম্যানেজার দ্বিজদাস ভাদুড়ীকে পরাজিত করেন এবং পরে ঝাড়গ্রাম লোকাল বোর্ড থেকে মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। ময়ূরভঞ্জ রাজা প্রথমে ছিলেন ইংরেজ বিরোধী ও মারাঠাদের সমর্থক। ১৮০৩ সালের পর মারাঠারা বিদায় নিলে ময়ূরভঞ্জ রাজা ইংরেজদের পক্ষ গ্রহণ করেন। কিন্তু, গোপীবল্লভপুরের অধিবাসীরা ইংরেজ বিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিয়ে কংগ্রেসপ্রার্থীকেই জয়যুক্ত করেন।

বেলিয়াবেড়ার সুসন্তান গোপীনাথ পতি বহু বৎসর ধরে মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৩৪ সালে ঝাড়গ্রাম মহকুমা আদালতে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং নানাভাবে ঝাড়গ্রাম মহকুমা কংগ্রেস কমিটিকে সাহায্য করেছেন। ১৯২৭-২৮ সালে বিনপুর থানা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয় জনৈক বিহারীলাল পড়িয়ার উদ্যোগে। বিহারীলালের বাড়ি কাঁথি মহকুমায়। তিনি জেলাবোর্ডের স্বাস্থ্য বিভাগের একজন হেলথ-অ্যাসিসট্যান্ট রূপে বিনপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি জেলাবোর্ডের কর্মীরূপে বিনপুর, শিলদা, লালগড়, দহিজুড়ি, কুই, কাঁকো, হাড়দা, সাহাড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে স্বাস্থ্য বিষয়ক কাজে গিয়ে কংগ্রেসের বার্তা ছড়িয়ে দিতে থাকেন।

অন্যদিকে ঝাড়গ্রামের দক্ষিণে পাথরা অঞ্চলের বৈকুণ্ঠনাথ মাহাতো, পদিমা অঞ্চলের পুর্ণচন্দ্র ঘোষ ও কুমুদচন্দ্র দাস, পেটবিন্ধি অঞ্চলের উমেশচন্দ্র বাগ, কুশমাড়ের ডা: সাধু মজুমদার, বেলিয়াবেড়ার রাধানাথ পতি, গোপীবল্লভপুর অঞ্চলের ধরণীধর দাস, কৃত্তিবাস দাস, রজনীকান্ত দাস, প্রফুল্ল কুমার দুবে ও সচ্চিদানন্দ অধিকারী এবং মহাপাল অঞ্চলের শ্রীনিবাস দাস প্রমুখ মিলিত হয়ে মহাপাল অঞ্চলে একটি শক্তিশালী কংগ্রেস কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন পদিমার পূর্ণচন্দ্র ঘোষ এবং সম্পাদক নির্বাচিত হন শ্রীনিবাস দাস। গোপীবল্লভপুর থানার স্যানিটরি ইনসপেক্টর শশীভূষণ দে

ও হেলথ এ্যাসিসট্যান্ট বরেন্দ্রনাথ মাইতি এই কংগ্রেস কমিটির কাজে খুবই সহযোগিতা করতেন।

১৯২৯ সালে আসন্ন লাহোর কংগ্রেস উপলক্ষে কংগ্রেসের প্রচারের কাজ ব্যাপক আকার ধারণ করে। তখন গোপীবল্লভপুর, মহাপাল, পদিমা, বেলিয়াবেড়া, চোরচিতা, চন্দ্রী, প্রভৃতি স্থানে জনসভার অধিবেশনে কংগ্রেসের লক্ষ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জেলা বোর্ডের ম্যাজিক ল্যানটার্ন ডেমন্সট্রেটর অনন্তকুমার মুখার্জী, বিনপুরের হেলথ এ্যাসিস্ট্যান্ট বিহারীলাল পড়িয়া, কুমার চন্দ্র জানা প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভই ভারতের লক্ষ্য বলে ঘোষিত হয় এবং সেই লক্ষ্য পূরণের পথ হিসেবে অহিংস আইন অমান্যের পথকেই বেছে নেওয়া হয়।

১৯৩০ সালের ১২ মার্চ সবরমতী আশ্রম থেকে মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষের যে ৭৮ জন আশ্রমবাসী ইংরাজ-রাজের বিরুদ্ধে আইন অমান্য করার জন্য ডান্ডি অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের একজন ছিলেন তৎকালীন ঝাড়গ্রাম মহকুমার গোপীবল্লভপুরের অধিবাসী মতিলাল দাস। মতিলাল ছিলেন মহাত্মা গান্ধির অনুগামী এবং ডান্ডি অভিযানে তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ। (বসন্ত কুমার দাস, পূর্বোক্ত, পৃ.- ৫, ১৮৬)

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ গোপীবল্লভপুরের যুবশক্তিকে চঞ্চল করে তুলেছিল, তার আর এক ঐতিহাসিক সাক্ষী বন্দী বাবু ধনঞ্জয় কর। এই ধনঞ্জয় কর ছিলেন ঝাড়গ্রাম মহকুমার একজন সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি বেশির ভাগ সময় জেলে কাটানোর জন্য স্থানীয় মানুষজনের কাছে বন্দী বাবু নামে পরিচিত।

বর্তমান গোপীবল্লভপুরের নয়াবসান গ্রামে এক ওড়িয়া ব্রাহ্মণ পরবারে তাঁর জন্ম। তিনি বারিপদা জিলা স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি মেদিনীপুরে এসে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। তিনি মেদিনীপুরে অনুশীলন সমিতির সদস্য হয়েছিলেন। মেদিনীপুরে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে জেলা শাসক জেমস পেডিকে হত্যা করেন বিমল দাশগুপ্ত এবং যতিজীবন ঘোষ, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে জেলা শাসক রবার্ট ডগলাসকে হত্যা করেন প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য এবং প্রভাংশু পাল এবং ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে জেলাশাসক বার্জকে হত্যা করেন অনাথবন্ধু পাঁজা এবং মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত। ভয়ে আর কোনো ব্রিটিশ জেলা শাসক মেদিনীপুর আসেননি। কিন্তু, এর জন্য মেদিনীপুর জেলা ব্যাপী শুরু ব্যাপক ধরপাকড়। এই তিনটি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গেই ধনঞ্জয় করের নাম জড়িয়ে যায়। ইংরাজ-পুলিশ তাঁকে ধরার জন্য গোপীবল্লভপুর থানার নয়াবসানে তাঁর বাড়িতে আসে। সেখানে তাঁকে না পেয়ে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ধরার জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। তবুও পুলিশ তাঁকে ধরতে পারেনি। কিন্তু, ধরা না দিলে পুলিশের গুলিতে মারা যাবেন, এই ভয়ে তার বড় শ্যালক তারাপদ ত্রিপাঠী তাঁকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেন। ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৩৮ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত তাঁকে মেদিনীপুর, বক্সার, বহরমপুর জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ আগস্ট তিনি নিঃশর্ত মুক্তি পান। কিন্তু, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশ পুলিশ পুনরায়

তাঁকে বন্দী করে এবং মেদিনীপুর, হিজলি, দমদম এবং ঢাকা জেলে বন্দী করে রাখার পরে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে মুক্তি দেয়। কমবেশি প্রায় দশ বছর জেল-বন্দীর জীবন কাটানোর জন্য স্থানীয় মানুষ তাঁকে "বন্দী বাবু" বলে ডাকত। বন্দীবাবু ধনঞ্জয় কর গোপীবল্লভপুরের এক জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। স্বাধীনতালাভের পরে যখন সারা ভারতবর্ষে কংগ্রেস দলের জয় জয়কার, তখন ১৯৫২ সাল থেকে পরপর তিনবার তিনি অকংগ্রেসী সদস্য হিসেবে বিধানসভার ভোটে দাঁড়িয়ে জয়লাভ করেছিলেন। গোপীবল্লভপুরের মানুষ সেই সময়ের কংগ্রেসকে ছেড়ে ব্যক্তি ধনঞ্জয় করের উপরেই আস্থা রেখেছিল।

গোপীবল্লভপুর সহ সমগ্র ঝাড়গ্রামের আদিবাসী এবং অ-আদিবাসী মানুষজন স্বাধীনতা সংগ্রামে কতটা সাক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তার খুব বেশি তথ্য প্রমাণ হয়তো নেই, কিন্তু, ঝাড়গ্রাম ও গোপীবল্লভপুরকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে যে স্বাধীনতা যুদ্ধের ঢেউ উঠেছিল তা ভালোভাবেই অনুধাবন করা যায়। ১৯৩৭ সালে ভারত সরকার আইন (Government of India Act, 1937) পাশ হলে ব্রিটিশ সরকার বাংলা বিধানসভার নির্বাচন ঘোষণা করেন। ভারতের ব্রিটিশ সরকার প্রত্যেক কংগ্রেস প্রার্থীর বিপক্ষে এ দেশীয় প্রভাবশালী অনুগত ব্যক্তিদের দাঁড়াবার ব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে করে। কংগ্রেসের জনপ্রিয় নেতা দেবেন্দ্রলাল খানের বিপক্ষে দাঁড়ান রায়সাহেব শম্ভুচরণ দত্ত এবং কিশোরীপতি রায়ের বিপক্ষে দাঁড়ান ঝাড়গ্রামের রাজা নরসিংহ মল্লদেব। ইংরেজ সরকার কংগ্রেস কমিটিকে অবৈধ ঘোষণা করে এবং নেতাদের হয় বন্দী করে অথবা নির্বাসনে পাঠায়। সরকারি অফিসারদের দ্বারা কংগ্রেস প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রচারও চালানো হয় এবং কংগ্রেস প্রার্থীদের ভোট দিলে তাদের উপরে নির্যাতন আরো বেড়ে যাবে বলে ভয় দেখানো হয়। কিন্তু, নির্বাচনে এই জেলার মানুষ বিদেশী শাসকের সমস্ত প্রকার চোখ রাঙানি ও শাসানিকে উপেক্ষা করে ভোটাধিকার প্রয়োগে জেলার সমস্ত কংগ্রেস প্রার্থীকে জয়যুক্ত করেন। এই সমস্ত ঘটনাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সেই সময়ে ঝাড়গ্রামে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিভূ কংগ্রেস দল কতটা শক্তিশালী ছিল। (Narendra Nath Das : Fight for freedom in Midnapore, 1928-38, 1980, P-171)

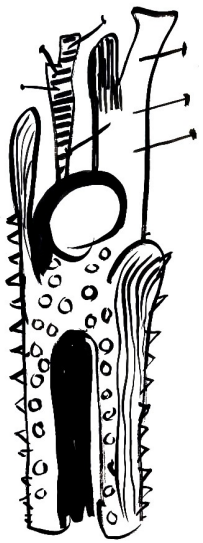

তাই, বোধ হয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ঝাড়গ্রামে ছুটে এসেছিলেন এখানকার মানুষজনকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গতি প্রকৃতি জানাতে। যে সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ ভারতে ব্রিটিশের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন, যাঁকে কারাগারে অন্তরীণ করে রাখার জন্য ব্রিটিশ সরকার একের পর এক ফন্দি করেছিল, সেই দূরদর্শী জাতীয় নেতা নেতাজি তাঁর শত ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর অন্তর্ধানের আগে আগে ঝাড়গ্রামের মত অরণ্যভূমিতে ছুটে এসেছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

সময়ে যখন সমগ্র ভারতবর্ষ উত্তাল, তখন তিনি ঝাড়গ্রামের কংগ্রেসকর্মীদের ত্যাগ ও সংগ্রামের পথে স্বাধীনতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করতে এসেছিলেন। এই সময়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে গান্ধিজির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মতপার্থক্য বাইরে বেরিয়ে আসে। সুভাষ চন্দ্র বসু বিভিন্ন স্থানে কর্মীসভা ও প্রকাশ্য সভায় মানুষকে বোঝান যে, আপোষ নীতিতে থেকে ইংরাজদের কাছ থেকে স্বরাজ পাওয়া যাবে না, এর জন্য প্রয়োজন ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সগ্রাম। তিনি এই উদ্দেশ্যে কংগ্রেসকে পুনর্গঠনের জন্য বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি মেদিনীপুরে এসেছিলেন এবং নানা স্থানের মধ্যে ঝাড়গ্রামের কর্মীসভাতেও ভাষণ দিয়েছিলেন। ১৯৪০ সালের ১২ মে সুভাষ চন্দ্র বসু ঝাড়গ্রামে সারাদিন থেকে একটি কর্মী সভা, ঝাড়গ্রামের আইনজীবীদের সঙ্গে একটি বৈঠকি সভা ও একটি প্রকাশ্য জনসভা করে গিয়েছিলেন। এই তথ্য থেকে জানা যায় যে, সে সময়ে ঝাড়গ্রামও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পিছিয়ে ছিল না। সুভাষচন্দ্র জানতেন যে, ঝাড়গ্রামবাসী ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের বিধানসভা নির্বাচনে ব্রিটিশের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে ব্রিটিশবন্ধু ঝাড়গ্রাম রাজাকে এবং ময়ুরভঞ্জের রাজার ম্যানাজারকে পরাজিত করে এই মহকুমার সমস্ত কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়যুক্ত করেছিল। তাছাড়া, ব্রিটিশ ভারতে যেখানে কংগ্রেস করা মানে ব্রিটিশ বিরোধী হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করা, সেখানে এই ঝাড়গ্রামবাসীই দহিজুড়িতে বিরাট তোরণ বানিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা প্রদানের সাহস দেখিয়েছিল।

সুভাষচন্দ্র ১৯৪০ সালের ১১মে শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে ট্রেনে মেদিনীপুর আসেন এবং নাড়াজোল রাজার অতিথি হিসেবে গোপপ্রাসাদে (বর্তমান গোপ কলেজ) রাত্রিবাস করেন। পরের দিন ১২ মে সকালে তিনি রাজকুমার দেবেন্দ্রলাল খান ও কংগ্রেসকর্মী রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সঙ্গে মোটরগাড়িতে চেপে ধেড়ুয়া হয়ে ঝাড়গ্রাম এসেছিলেন। তখন এটাই ছিল ঝাড়গ্রাম আসার একমাত্র চালু পথ। আসার পথে দেপাড়া গ্রামে একদল কীর্তনীয়া বন্দেমাতরম ধ্বনির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রকে মাল্যদান করেন। তারপরে চাঁদড়ায় পৌঁছালে মহিলারা শঙ্খধ্বনির সঙ্গে তাঁকে চন্দন চর্চিত করেন। সেখানে মুচিরাম সিং, শশধর পাল, বরেন্দ্রনাথ মাইতি ও কিশোরীমোহন মাহাত প্রমুখ কংগ্রেস কমীবৃন্দ এবং স্থানীয় নরনারী তাঁকে সম্বর্ধিত করেন। সম্বর্ধনার উত্তরে নেতাজি সকলকে সংঘবদ্ধভাবে স্বরাজলাভের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান করেন। ধেড়ুয়াতে কংসাবতী নদীতে মোটরগাড়ি পারাপারের জন্য একটি লোহার বোট রাখা থাকত। ঐ বোটে মোটরগাড়ি পার করে বৈতা ঘাটে উঠে সুভাষচন্দ্র দহিজুড়ি হয়ে ঝাড়গ্রাম এসেছিলেন।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দহিজুড়িতে সুভাষচন্দ্রকে অভ্যর্থনা জানাতে বিশাল "শাসমল তোরণ" নির্মাণ করা হয়েছিল এবং সুভাষচন্দ্রকে দর্শন করার জন্য প্রচুর জনসমাগম ঘটেছিল। এখানে তৎকালীন সময়ে মহিলারা এসে চন্দন তিলক এবং ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। এখানে নিকুঞ্জ মণ্ডল, আশুতোষ মিশ্র ও সস্ত্রীক দেবাদিদেব রায় সুভাষচন্দ্রকে মাল্য প্রদানে অভিনন্দিত করেছিলেন। জনতার অনুরোধে তিনি এখানেও ভাষণ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, আপোসের দ্বারা নয়, ত্যাগ ও সংগ্রামের পথেই স্বরাজ লাভ করতে হবে। ঝাড়গ্রামে পৌঁছে তিনি নেলিকো সিডস স্টোরসের মালিক নলিনবিহারী মল্লিকের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।

জানা যায়, সেখানে কুমারী অনিমা মল্লিক ও সাহানা দাস তাঁকে মাল্যদান ও চন্দন-চর্চিত করেন এবং নীলিমা কুণ্ডু, স্নেহলতা দাস প্রমুখের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ বন্দে মাতরম সংগীত করেন।

দুপুরে সুভাষচন্দ্র একটি কর্মীসভায় সভাপতিত্ব করেন। এই কর্মীসভায় ডা: যতীশচন্দ্র ঘোষ, মোহিনীমোহন মণ্ডল, জওহরলাল বক্সী, নন্দদুলাল সিং, দেবেন দাস, প্রমথনাথ ব্যানার্জী, দেবেন্দ্রলাল খান সহ অখণ্ড মেদিনীপুর জেলার বহু কংগ্রেসকর্মী যোগদান করেন। এখানে সুভাষচন্দ্র সেই সময়ে ভারত এবং ইউরোপের পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তব্য রেখে তার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য একটি কর্মপরিষদ গঠনের প্রস্তাব দেন।

সেদিন বিকেলে বার লাইব্রেরিতে আইনজীবীদের সঙ্গে মিলিত হন। সেখান থেকে শোভাযাত্রা করে বর্তমান দুর্গা ময়দানে (তৎকালীন লালগড় মাঠে) প্রকাশ্য জনসভায় যোগ দিতে যান। সভায় আসা মাত্র বাজি পুড়িয়ে এবং বিপুল জয়ধ্বনি দিয়ে গান গেয়ে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়েছিল। তারপরে মহিলাদের দুটি দল পরপর "দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী' এবং 'ঝাণ্ডা উচা রহে হামারা" দুটি গান পরিবেশন করার পরে কৃষক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং যুবক সমিতির পক্ষ থেকে রামচন্দ্র মাহাত নেতাজির উদ্দেশ্যে দুটি মানপত্র পাঠ করেন। এই সম্মাননার জবাব দিতে গিয়ে সুভাবচন্দ্র সুদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। সুভাষচন্দ্র কলকাতার কয়েকটা সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে একতরফা জাতীয়তা বিরোধী সংবাদ পরিবেশনের দ্বারা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগ করেন। এরা বাংলার কংগ্রেসের নীতি ও কর্মপন্থা সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করে তাঁদের হেয় করতে চাচ্ছে। তিনি হিন্দুমহাসভার কর্মকাণ্ডেরও সমালোচনা করেন। তিনি এখানে মহাত্মা গান্ধির আপোষ নীতিরও প্রবল সমালোচনা করেন। তিনি এখানে বলেন, আপোষের পথে নয়, দরকষাকষি করে নয়, স্বরাজ পেতে হবে ত্যাগ এবং সংগ্রামের পথে।

বিভিন্ন মহলের ইচ্ছাকৃত বাধায় সুভাষচন্দ্রের সভায় লোক সমাগম কিছু কম হয়েছিল। বিশেষ করে ঝাড়গ্রামের রাজা ব্রিটিশদের অনুগত থাকায়, তাঁর ম্যানেজার দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের মাধ্যমে সর্বত্র খবর পাঠানো হয়, যেন এই সভায় কেউ না যোগ দেয়। রাজার অর্থানুকুল্যে রাজমাতার নামে স্থাপিত কুমুদ কুমারী ইনস্টিটিউসনের প্রধান শিক্ষক রাধাশ্যাম বসু দেবেন্দ্রমোহনের নির্দেশে সুভাষচন্দ্রের সভায় না যাবার জন্য সমস্ত শিক্ষকদের কাছে এবং প্রতি ক্লাসে নোটিশ পাঠিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। সুভাষচন্দ্র সভায় দাঁড়িয়ে

রাধাশ্যামবাবুর এই কাজের যথোচিত সমালোচনাও করেছিলেন! তবে আশ্চর্যের বিষয় এটাই যে, তৎকালীন সময়ে ঝাড়গ্রাম রাজার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে প্রচুর মানুষ সভায় উপস্থিত হয়ে বোঝাতে পেরেছিলেন, রাজাকে তারা শ্রদ্ধা করলেও ব্রিটিশের পদসেবা নয়, আপোষের দ্বারা স্বাধীনতা নয়, ঝাড়গ্রাম চায় ত্যাগ ও সংগ্রামের দ্বারা পূর্ণ স্বরাজ। (নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু-র ঝাড়গ্রাম সফর : সং তারাপদ কর)

আমরা জানি, সুভাষ চন্দ্র কেবল বীরশ্রেষ্ঠ ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন ইতিহাস সচেতন রাষ্ট্রনেতা। তিনি জানতেন, ঝাড়গ্রামের সমস্ত জনজাতি সম্প্রদায় সহ নিম্নবর্গের মানুষরাই দেশজ মানুষের অধিকার অর্জনের জন্য সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজদের বিরদ্ধে প্রথম আন্দোলন করেছিল। তিনি এও জানতেন, কোনোরূপ পরিণতির কথা না ভেবে নিজেদের সামান্য তির-গুলতি-বর্শা-টাঙ্গি নিয়ে যারা বন্দুকধারী ইংরাজদের বিরুদ্ধে ৩৪ বছর ধরে লড়াই করে, যারা তাদের প্রিয় রাজাকে ভোট না দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের হোতা কংগ্রেস দলের পক্ষে ভোট দেয়, তারা স্বাধীনতা সংগ্রামের মহাযুদ্ধের বাস্তব পরিস্থিতি তাদের বোঝানো প্রয়োজন সকলের আগে। তাই, ভারতবর্ষের স্বাধীনতাযুদ্ধের টালমাটাল সময়েও নেতাজির মত ব্যস্ততম মানুষ এখানে কংগ্রেসকর্মীদের বোঝাতে এসেছিলেন, সেই সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের অভিমুখ কী হওয়া উচিৎ।

স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ দশ বছরের মধ্যে ১৯৪০ সালে দহিজুড়িতে ব্রিটিশ রাজের এক নম্বর শত্রু সুভাষচন্দ্রকে সম্বর্ধনা প্রদানের জন্য সেখানকার কংগ্রেসকর্মীদের জনবল এবং বুকের পাটা থাকা চাই। দহিজুড়িতে কংগ্রেসের সেই শক্তি এবং সাহস ছিল বলেই তারা তোরণ বানিয়ে সুভাষচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করতে পেরেছিল। সংগঠন মজবুত না হলে সেই সময়ে এমন কাজ করার দুঃসাহস কংগ্রেসের হত না।

❁ — ❁ — ❁

জনশ্রুতির সত্যতা অন্বেষণ

উপেন পাত্র

১৯৭৫ সালে বেলিয়াবেড়া থানার অন্তর্গত (ঐ কালে গোপীবল্লভপুর থানা) মহাপাল শ্রী বিদ্যাপীঠে সহশিক্ষক পদে যোগ দিয়ে ঐ অঞ্চলে প্রচলিত দু'টি জনশ্রুতি বিষয়ে অবগত হই। প্রথমটি হলো-- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাই এই গ্রামে এসেছিলেন এবং দ্বিতীয়টি হলো-- এই গ্রামে অতীতে একটি মধ্য বাংলা বিদ্যালয় (ষষ্ঠ মান পর্যন্ত) ছিল। গোলকনাথ বসু বা গোলক পণ্ডিত ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

উপরোক্ত দু'টি জনশ্রুতির সত্যতা অন্বেষণের জন্য আমি কৌতূহলী হই। প্রথম জনশ্রুতি বিষয়ে কিছুই পাওয়া যায় না। বহু বয়স্ক জনের কাছে খোঁজ করতে গিয়ে শুনতে পাই যে তারা বাপ ঠাকুর্দার মুখ থেকে এই কথা শুনেছে। কিন্তু কেউই কথাটির সত্যতা যাচাই করেনি। এই বিষয়ে কোন তথ্যাদি না পেয়ে আমি এটিকে নিছক গুজব মনে করে, বুনো হাঁসের পেছনে ছোটার মত পণ্ডশ্রম মনে করে ক্ষান্ত হই।

দ্বিতীয় জনশ্রুতি বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারি যে অতীতে মহাপাল গ্রামে সত্যিই একটি মধ্য বাংলা বিদ্যালয় ছিল। রোহিনী গ্রাম নিকটস্থ রনজিতপুর

রামনারায়ণ ষড়ঙী স্মৃতি পাঠাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত "শিকড়ের খোঁজে" স্মরণিকা পুস্তকে জনৈক মৃত্যুঞ্জয় শতপথী(রামনারায়ণ ষড়ঙীর দৌহিত্র) তাঁর স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করেছেন যে তিনি মহাপাল মধ্য বাংলা বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন গোলক পণ্ডিত বা গোলকনাথ বসু।

তাঁর বিষয়ে জানতে পারি যে তিনি খুব পণ্ডিত ও রাশভারী ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি নারায়ণগড় এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি স্থানীয় লোক ভাষায় প্রথম সাহিত্য রচনা করেন। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডঃ ছন্দা ঘোষালের কাছ থেকে জানতে পারি যে "কাঁচের কাঞ্চনথাল"ও কাঁঠালের আমসত্ত্ব" নামে দু'টি প্রহসন রচনা করেন।

মেদিনীপুর নিবাসী গবেষক অরিন্দম ভৌমিক একদা গোলক পণ্ডিত বিষয়ে আমার কাছে জানতে চান। আমি প্রাপ্ত তথ্যাদি তাঁকে জানাই।

তিনি কৌতুহলী হয়ে এই বিষয়ে তথ্য সন্ধান করেন। তিনি খেলাড় গ্রামে গোলক পণ্ডিতের উত্তরপুরুষের বাড়িতে যান এবং তাঁর লেখা একটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিও সংগ্রহ করেন।

পরবর্তী কালে অন্য একটি বিষয়ে তথ্য সন্ধান করি। বিষয়টি হলো-- মহাপাল গ্রামের নিকটে পেটবিন্ধি ও যতিগোবরা নামে দু'টি গ্রাম আছে। উভয় গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় দু'টির নাম "শ্রীহরিচরণ প্রাথমিক বিদ্যালয়" এবং পেটবিন্ধি গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় আছে, যেটির নাম "আত্যয়িক প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়"।

আমি কৌতুহলী হই এই কারণে যে কোন ব্যক্তি নামে প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখা যায় না। এই শ্রীহরিচরণ ব্যক্তিটি কে ?এছাড়া এই এলাকায় অন্য কোথাও প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় নেই। এখানে কেন ?আত্যয়িক কথাটি কেন যুক্ত করা হয়েছে ?(আত্যয়িক কথাটির আভিধানিক অর্থ হলো জরুরীকালিন)।

এই বিষয়ে খোঁজ খবর করে জানতে পারি যে পেটবিন্ধি গ্রামের শ্রীহরিচরণ বাগ একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বেলিয়াবেড়ার জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ তাঁকে গৃহ শিক্ষক নিয়োগ করেন। শ্রীহরিচরণের ছাত্র কৃষ্ণচন্দ্রপুত্র বিশ্বম্ভর প্রহরাজ জমিদার হয়ে গুরুর নামে পেটবিন্ধি ও যতি গোবরা গ্রামে দু'টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বিষয়ে তথ্য সন্ধান করতে গিয়ে আমি চমৎকৃত হই। তিনি একাধারে সংস্কৃত পণ্ডিত, সাহিত্যিক, বিদ্যোৎসাহী ও প্রজা হিতৈষী ছিলেন। তিনি চারটি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও দুটি বাংলা প্রবন্ধ সংকলন লেখেন। একদা অতীতে " মেদিনীপুর সাহিত্য পর্ষদ" নামে এক সংস্থা ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র একদা ঐ সংস্থার সভাপতি ছিলেন। বর্তমান মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর ভবন চত্বরে ঐ সংস্থার কার্যালয় ছিল। তিনি জমিদার হয়েও বিনা বেতনে বেলিয়াবেড়া সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করতেন।

তিনি বেলিয়াবেড়া সমবায় ব্যাঙ্কের (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক) প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

বিদ্যালয়ে যোগ দেবার পর আমাকে বিদ্যালয় পাঠাগারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ঐ সময় পুস্তক তালিকা করতে গিয়ে মলাটহীন, কীটদষ্ট একটি বই হাতে পাই। কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ লিখিত "মনিমঞ্জুষা" নামে ঐ পুস্তকের কয়েকটি প্রবন্ধ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার মধ্যে "উৎস" নামক প্রবন্ধে তিনি দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকভাষা বিষয়ে আলোচনা করে লোকভাষাটিকে "সুবর্ণরৈখিক লোকভাষা" বলেন এবং তার দুই শাখাকে "পূবালী" ও
"খাণ্ডারী" নামে উল্লেখ করেন। পরবর্তী কালে
ডঃ সুধীরকুমার করন "খাণ্ডারী" শাখাকে
"গোপীবল্লভপুরী" নামকরন করেন এবং এই কথ্য ভাষার সাথে "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যের আদি-মধ্য বাংলা ভাষার সাদৃশ্য নিরূপণ করেন। দুর্ভাগ্যের কথা এই যে কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ লিখিত কোন পুস্তক একালে পাওয়া যায় না।

জনশ্রুতির সত্যতা অন্বেষণে জানতে পারি যে একদা বিদ্যাসাগর মশাই সমগ্র দক্ষিণ বাংলার বিদ্যালয় পরিদর্শক ছিলেন। ঐ সময়
বিদ্যাসাগর মশাইয়ের উৎসাহে ঐ কালে হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় শতাধিক প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। কিন্তু সরকারি সাহায্যের অভাবে অধিকাংশ বিদ্যালয় একে একে বন্ধ হয়ে যায়। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের অনুপ্রেরণায় তরুণ জমিদার
কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ ঐ কালে মহাপাল গ্রামে পূর্ব উল্লিখিত মধ্য বাংলা বিদ্যালয়ের নিকটে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দুই বছর পরে সুবর্ণরেখা নদীর ভাঙনে দু'টি বিদ্যালয় নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের পুনঃ প্রতিষ্ঠার কোন প্রয়াস হয়নি এবং ১৯৫৪ সালে বর্তমান মহাপাল শ্রী বিদ্যাপীঠ গড়ে ওঠে।

অন্যদিকে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরে প্রাথমিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিদ্যাসাগর মশাই প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় সমূহ বন্ধ হয়ে যাওয়াকে জাতীয় লজ্জা মনে করা হয়। হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় এইরূপ শতাধিক বিদ্যালয়ের গ্রামবাসীদের কাছ থেকে গন আবেদন দিতে বলা হয়।

পেটবিন্ধি গ্রামের শ্রীহরিচরণ বাগের পুত্র উমেশচন্দ্র বাগ এক স্বাধীনতা সংগ্রামীরূপে খ্যাত হন। তিনি বেঁটেখাটো চেহারার লোক ছিলেন এবং গান্ধীটুপি পরে থাকতেন। তাই লোকে তাঁকে বাঁটকুল গান্ধী বলতো। ততকালীন গ্রাম বাংলায় অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও জাতিভেদ দূরীকরণে তিনি অগ্রণী ভুমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর ছেলে যাদবচন্দ্র বাগও স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। পিতা পুত্র উভয়েই স্বাধীনতা সংগ্রামী ভাতা পেতেন।

উমেশবাবু ভারতের স্বাধীনতা লাভের কয়েক বছর পর মারা যান। যাদববাবুর ছেলে জিতেন আমার সহপাঠী, সে রেলওয়েতে চাকরি করতো। সেই সুত্রে খড়্গপুরে বাড়ী করেছে। একদা আমি যাদববাবুর সাক্ষাৎকার নিই। তিনি জানান যে নেতাজী যখন ঝাড়গ্রাম শহরে সভা করতে আসেন, তখন তিনি বালক বয়সে পিতার সাথে যান। উমেশবাবু নেতাজীর সাথে করমর্দন করেন এবং যাদববাবু তাঁকে প্রণাম করেন। যাদববাবু শেষ বয়সে খড়্গপুরে ছেলের কাছে থাকতেন। ওখানেই তিনি একশো দুই বছর বয়সে মারা যান।

উমেশচন্দ্র বাগ ঐ সময় বিদ্যাসাগর মশাই প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়টি পেটবিন্ধি গ্রামে প্রতিষ্ঠা করার জন্য গণস্বাক্ষর সমন্বিত আবেদন শিক্ষা দপ্তরে দাখিল করেন এবং তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব খাটান।

গণ আবেদনের ভিত্তিতে অধিকাংশ প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়কে জরুরিকালিন অনুমোদন দেওয়া হয় এবং বিদ্যালয়গুলির নাম হয় আত্যয়িক প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়।

বন্ধু গবেষক মধুপ দে (প্রাক্তন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, প্রাথমিক)এর কাছ থেকে জানতে পারি যে পরবর্তী কালে উক্ত বিদ্যালয়গুলির সাধারণীকরণ করা হয়। ফলে আত্যয়িক কথাটি আর লিখিত হয় না।

❁ — ❁ — ❁

ভারতের স্বাধীনতা ও জঙ্গলমহল

নারায়ণ মাহাত

সমাজমাধ্যম এবং 'প্রচেষ্টা'র পক্ষে কল্যাণীয় শ্রীমুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ফোনালাপে "ভারতরে স্বাধীনতা ও জঙ্গলমহল শিরোনামে লেখা পাঠানোর অনুরোধ এল। স্বাগত মুকুন্দ, স্বাগত 'প্রচেষ্টা'। হালে আমার শরীরটা মোটেও ভাল যাচ্ছে না। করোনা, সেইসঙ্গে হেপাটাইটিসের হ্যাপা। তবুও কথা দিলাম, ছোটখাটো একটা লেখার প্রচেষ্টা করব।

লেখার নির্দ্ধারিত শিরোণাম দেখে এবং শুনে চুয়াড় বিদ্রোহের ২০০ বছর পূর্তিতে লেখাগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। লেখাগুলো সেইসময় কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশ লাভ করেছিল। সেগুলোর মধ্যে হয়ত কোনও একটা লেখা প্রচেষ্টার জন্য তুলে দিতাম। কিন্তু, নিয়মাবলী বলছে, সেটা করা যাবে না। তাই এই ছোট্ট লেখাটির অবতারণা।

ভারতের স্বাধীনতা ও জঙ্গলমহল বিষয়টি বহুধা বিস্তৃত। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জঙ্গলমহলের স্বাধীনচেতা মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস নিয়ে এখনও সেভাবে কাজ হয়নি। ছিন্ন বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কাজ অবশ্যই হয়েছে কিন্তু, তা যৎসামান্য। আসলে কার সংগ্রামের কথা কেই বা লেখে!

যাই হোক, এবার বিষয়ের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করা যাক। আমার সৌভাগ্য, — পশুপতিদার (মানববিজ্ঞানী ড. পশুপতি প্রসাদ মাহাত) ডাকে, আজ থেকে ৩০ (তিরিশ) বছর আগে, (১৯৯২ সালের ১৫-১৭ মে) তারিখে সুডেন্স্ হল, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতায় অনুষ্ঠিত "মেড়ি আন্দোলনের ৭৫ (পঁচাত্তর) বছর পূর্তি উদ্যাপন

কমিটি আয়োজিত আলোচনা সভাতে যোগ দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেটাই আমার আজকের লেখার প্রতিপাদ্য। সে কথায় আসছি একটু পরে। তার আগে আর একটি উদ্যোগের কথা উল্লেখ করি। চুয়াড় বিদ্রোহের (আসলে জঙ্গলমহলের স্বাধীনতা সংগ্রাম) ২০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে স্থানীয়ভাবে শিলদা বিশ্বকর্মা ক্লাবে (পশ্চিম মেদিনীপুর, এখনকার ঝাড়গ্রাম জেলা) একটি আলোচনা সভা আয়োজন করেছিলেন শ্রী ক্ষেত্র উন্নয়ন সমিতি ও কবিতা মঞ্চের পক্ষে মাননীয় শ্রী যতীন্দ্রনাথ মাহাত ও শ্রী গোকুলানন্দ লাহা মহাশয়।

মূলতঃ আন্দোলন সংগ্রাম তখনই সংঘটিত হয়,— যখন মানুষ অত্যাচারে অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ যখন অন্যায়-অত্যাচারের সীমা লঙ্ঘিত হয়। ১৭৬৮ থেকে ১৭৯৮, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সারা জঙ্গলমহল এলাকা (ব্রিটিশ শাসিত ভারতের সাবেক জঙ্গলমহল জেলা) জুড়ে কৃষকসমাজ- রাজা-জমিদার একসঙ্গে সংগ্রামে ব্যাপকভাবে সামিল হয়েছিলেন। সেই সংগ্রামগুলোর মধ্যে চুয়াড় বিদ্রোহ (১৭৬৫-১৭৭৯), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৮৫-১৮৫৬), মুণ্ডা-ভূমিজ বিদ্রোহ (১৮৫৭), কোল বিদ্রোহ (১৮৩১-১৮৩২), মেড়ি আন্দোলন (১৯১৭-১৯১৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মেড়ি আন্দোলন (১৯১৭-১৯১৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মেড়ি আন্দোলন সম্পর্কে জানা যায়,— ১৯১৭ সাল থেকে শুরু হয়েছিল বাংলা, বিহার (এখনকার ঝাড়খণ্ড) উড়িষ্যা এলাকার কৃষক গণসংগ্রাম। জমি থেকে কৃষক উচ্ছেদ, ক্রমবর্দ্ধমান খাজনার বোঝা, মহাজনী, জলকর, পথকর, জঙ্গল ব্যবহারের বিধি নিষেধ কৃষক সাধারণের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। এর বিরুদ্ধে (ব্রিটিশ কোম্পানীর বিরুদ্ধে) সাঁওতাল, মুণ্ডা-ভূমিজ, কুড়মি, ওরাঁও সহ বিভিন্ন জনজাতির / গোষ্ঠীর মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল পাঁচেৎ, বাঘমুণ্ডি, বাগনকুদর, কাশীপুর, তরফবালিয়াপার, ঝালদা- জয়পুর, হেঁসলা - চুটি, পাতকুম, ভঞ্জভূম, নাগরকিয়ারী, তোড়াং, মানবাজার, অম্বিকানগর, ছাতনা, সুপুর, বরাভূম, কুইলাপাল, সিমলাপাল, রাইপুর, শাঁখাকুল্হি - কল্যাণপুর (দহিজুরি), ভেলাইডিহা - ফুলকুশমা, ঝাঁটিবনি, ধলভূম, লালগড়, ঝাড়গ্রাম, জামবনি, রামগড় ইত্যাদি জনপদের (পরগণা) কোনে কোনে,- এক কথায় সারা জঙ্গলমহল এলাকায়। মেড়ি আন্দোলনে শহিদ হন কালিয়া মাঝি, কঁকা মাহাত, রামেশ্ব সিংমুণ্ডা ও হ্রদু কোলকামার। সহস্রাধিক লোকের কারাদণ্ড হয় ও যাবজ্জীবন দণ্ডিত হন ৩৭ (সাঁইত্রিশ) জন।

আর মেড়ি আন্দোলনের আরও আগেকার সংগ্রামীদের মধ্যে রয়েছেন তিলকামাঝি, সিধু-কানু-চাঁদ-ভৈরো মুর্মু, বীরসা মুণ্ডা, রঘুনাথ মাহাত, রঘুনাথ সিং, রাণী শিরোমণি, রাণী কিশোরমণি, জগন্নাথ ধল, এবং তার সঙ্গে

ছিলেন হাঁসাং রাজা, কাঁসা সিং, বিষণ সিং, রঘুনাথ মাহাত প্রমুখ। কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণি বগড়ির অচল সিং, আরো অগণিত সংগ্রামী।

স্বাধীন ভারতের বয়স এখন পাঁত্তর বছর।
বছর কিসের এত সোর গোল আর লহর চহর ?
অবশেষে বলি —
আজকে আবার জাগ জাগবার সময় সমাগত।
স্বাধের স্বাধীনতা স্বপ্ন হয়ে গেছে হত।।

কৃতজ্ঞতা :

- মেড়ি আন্দোলনের পঁচাত্তর বছর পূর্তি উদ্‌যাপন কমিটি - ১৯৯২।
- চুয়াড় বিদ্রোহের ২০০ বছর পূর্তি — যৌথ উদ্যোগ - শ্রীক্ষেত্র উন্নয়ন সমিতি ও কবিতা মঞ্চ।
- জঙ্গলমহলের কৃষক বিদ্রোহ গীতিকথা : নারায়ণ মাহাত।

❁ — ❁ — ❁

ঝাড়গ্রাম ও স্বাধীনতার লড়াই

ড. অমৃত কুমার নন্দী

এখন হয়েছে জেলা। আগে ছিল মহকুমা। অরণ্যসুন্দরী ঝাড়গ্রাম। বরাবরই ছিল দুয়োরানী। তাই ১৯২২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী মহকুমা হিসেবে জন্ম নেওয়ার পর থেকে এই সুন্দরী থেকে গেছে অবহেলিত, উপেক্ষিত এবং অপ্রচারিত। ২০১৭ সালের ৪ঠা এপ্রিল জেলা হিসেবে ঝাড়গ্রামের আত্মপ্রকাশ। জেলা হল, কিন্তু পাঁচ বছর পরেও তৈরী হলনা জেলার সার্বিক পরিকাঠামো। ঝাড়গ্রামের সহজ-সরল-শান্তিপ্রিয় মানুষের তেমন কোন ক্ষোভ নেই তাতে। তাঁদের চোখের সামনে অবহেলা, উপেক্ষা, বঞ্চনা— যা কিছু ঘটে চলেছে— তাঁরা সবই সহ্য করেন এক অদ্ভুত উদাসীনতায়। এই সহনশীলতা বোধ হয় তাঁদের উত্তরাধিকার। এই অধিকার মনে হয় তাঁরা প্রাপ্ত হয়েছেন সনাতন ধর্মের মর্মকথা থেকে। এই সহনশীলতার পাঠ প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ দিয়েছিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে। বিহ্বল ও বিমূঢ় অর্জুনকে বোঝাতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— "তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত।।" (গীতা, ২/১৪) হে অর্জুন, তোমার চোখের সামনে যা কিছু ঘটছে, তুমি সহ সহ্য কর।

তবে এই সহ্য করা মানে ফোঁস করা থেকে দূরে থাকা নয়। দুর্জনের বিরুদ্ধে ফোঁস করার কথা বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। ব্রিটিশ শক্তির সামনে মাথা নোওয়ানো নয়, যতরকমভাবে ফোঁস করা যায়, তাই করেছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষে ঝাড়গ্রামের মানুষ। আগুন ছিল। কিন্তু সেই আগুন প্রচারের আলো পায়নি ইতিহাসের পাতায়। সাম্প্রতিক সময়ে প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে আলোকিত সংগ্রামকে আলোকিত করার। সেই আলোককে আরো উজ্জ্বল ও বিস্তৃত করার এক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা নেওয়া হল বর্তমান নিবন্ধে।

১৮৮৫ সাল। গঠিত হল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। ব্রিটিশ শাসকের প্রতি

দলের মনোভাব প্রশ্নাতীত না হলেও, বিংশ শতাব্দীতে ভারতবাসী স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় কংগ্রেস দলকটিকে বসিয়েছিল একই বন্ধনীর মধ্যে। কংগ্রেস কর্মী = স্বাধীনতা সংগ্রামী, স্বাধীনতা সংগ্রামী = কংগ্রেস কর্মী— এই ছিল তখনকার সমীকরণ। ১৯২২ সালে মহকুমা হিসেবে জন্ম নেওয়ার সময় থেকেই জাতীয় কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্ব ঝাড়গ্রামে বিভিন্নভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। ঝাড়গ্রাম বাসীর সহযোগিতায় স্বাধীনতার লড়াইকে ঐ নেতৃত্ব কখনও নিয়ে যায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পর্যায়ে, কখনও বা পরোক্ষ সমর্থন দিয়ে পাশে দাঁড়ায় তাঁদের, যাঁরা করে চলেছেন লড়াই।

১৯২১ সাল। গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে সারা দেশ উত্তাল অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলাও সেই আন্দেলানে হয়েছে সামিল। আন্দোলনের ঢেউ এসে পড়েছিল। ১৯২২ সালে গঠিত ঝাড়গ্রাম মহকুমাতেও। ঐ বছরেই গঠিত হয় মহকুমা কংগ্রেস কমিটি। দীনেশ চন্দ্র সেনগুপ্তকে নির্বাচিত করা হয় কমিটির সভাপতি। কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন গদাধর মণ্ডল। ইনি রগড়ার বাসিন্দা। আইন ব্যবসায়ী (মোক্তার) হিসেবে কাজ করতেন ঝাড়গ্রাম মহকুমা আদালতে। তাছাড়া, সমাজসেবী হিসেবে তাঁর ছিল যথেষ্ট পরিচিতি। সেই সময় মহকুমা কংগ্রেসে আরো কয়েকটি মুখ ছিল সুপরিচিত। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে অবিনাশচন্দ্র সেনগুপ্ত, তারাপদ দে প্রমুখ।

স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাড়গ্রাম মহকুমার প্রত্যক্ষ মদতের আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। মেদিনীপুর জেলার বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে জেলায় তখন পরিচিতি লাভ করেছেন 'কালো ষাঁড়' নামে। জেলার অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা তিনি। ১৯২২ সালেই তাঁকে আমন্ত্রণ করে আনা হয় গিধনীতে। দেওয়া হয় বিশাল জমায়েত করে সম্বর্ধনা। গিধনীর মানুষ খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা শৈলজানন্দ সেন ছিলেন এই সম্বর্ধনা সভার আয়োজক ও উদ্যোক্তা। আদিবাসী সম্প্রদায়ের বহু মানুষ সহ সভায় যোগ দেন প্রায় পাঁচ হাজার লোক।

ইংরেজ শাসনাধীন দেশে প্রায় সব জমিদারই ছিলেন অত্যাচারী এবং শোষক। ১৯২২ সালে একজোট হন অত্যাচারী জমিদারেরা। ঝাড়গ্রাম মহকুমার জমিদারেরা প্রজাপীড়নের মতলব আঁটেন একটি পদ্ধতিতে। সেটেল্‌মেণ্টের সত্বলিপিতে তখন চালু হয়েছে সেচকর, খাদকর, কাঁটাকর ও পাতাকর এবং পথকর। এই পাঁচধরণের করের চাপে মানুষ এমনিতেই নাজেহাল। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত জমিদারেরা ফন্দি আঁটলেন অতিরিক্ত টাকা আদায়ের। ঘোষণা করলেন প্রত্যেক করে টাকা প্রতি দিতে হবে এক পয়সা হারে অতিরিক্ত কর। পীড়নমূলক এই ঘোষণায় চুপ করে থাকেননি ঝাড়গ্রামের মানুষ। গড়ে উঠে ব্যাপক আন্দোলন। আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে নেতৃত্ব দেন কংগ্রেস নেতা শৈলজানন্দ সেন। তাঁকে সহযোগিতা করেন সুন্দর

নারায়ণ মাহাতো, হরমোহন মাহাতো, রমানাথ মাহাতো, উপেন্দ্রনাথ মাহাতো, কুলু মাহাতো, রাজীব মাহাতো, শিমুল সাঁওতাল, টুনিয়া মাণ্ডি, তারাপদ দে, জাহ্নবী চ্যাটার্জী, রমানাথ দত্ত, দর্পনারায়ণ বেরা, রাধানাথ বেরা, উপেন্দ্রনাথ বেরা, চন্দ্রমোহন রানা, যুগল কিশোর রানা, যতীন্দ্রনাথ দণ্ডপাট এবং আরো অনেক কংগ্রেস কর্মী। বাড়তি কর বিরোধী এই আন্দোলনকে প্রভূত মদত দিয়েছিলেন আরো দুজন স্বনামধন্য কংগ্রেস নেতা। এঁরা হলেন মহেন্দ্রনাথ মাহাতো এবং কলকাতা হাইকোর্টের উকিল সাতকড়ি পতি রায়। সাতকড়িপতি রায়কে তাঁর কাজের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন সম্বর্ধনা দিতে শিলদা পরগণার মাহাতো এবং সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ। তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন অভিনন্দনজ্ঞাপক মানপত্র।

ঝাড়গ্রাম মহকুমার সব জমিদার ছিলেন না ব্রিটিশ রাজের তাঁবেদার। ইংরেজ শাসন ও শোষণের দুর্দিনেও কিছু জমিদার দাঁড়িয়েছিলেন মুক্তি সেনানীদের পাশে। তাঁদের মধ্যে লালগড়ের জমিদার যোগেন্দ্রনারায়ণ সাহসরায় এবং বেলিয়াবেড়ার প্রহরাজ কৃষ্ণচন্দ্র দাসমহাপাত্র স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহায্য করতেন অর্থ দিয়ে।

গোপীবল্লভপুর থানার ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকা বরাবরই থেকেছে সামনের সারিতে। এই থানার বেলিয়াবেড়া গ্রামের বাসিন্দা গোপীনাথ পতি। মেদিনীপুর শহরে এসেছিলেন ওকালতি করতে। জমে গিয়েছিল উকিলের ব্যবসা। দেশের প্রয়োজনে ভাটা পড়ল তাতে। সান্নিধ্যে এলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের। কংগ্রেস দলে যোগ দিলেন দেশপ্রাণের অনুপ্রেরণায়। নেমে পড়লেন ভোটের ময়দানে। লোকাল বোর্ডের নির্বাচনে হলেন গোপীবল্লভপুর থানার কংগ্রেস প্রার্থী। তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী ছিলেন ময়ূরভঞ্জরাজার প্রভাবশালী ম্যানেজার দ্বিজদাস ভাদুড়ী। ইংরেজ সমর্থিত প্রার্থী তিনি। ভোটে গোপীনাথ হারালেন দ্বিজদাসকে। তারপর গোপীনাথের রাজনৈতিক জীবনে হয় আর এক ধাপ উন্নয়ন। ঝাড়গ্রাম লোকাল বোর্ড থেকে তিনি নির্বাচিত হন মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের সদস্য হিসেবে।

এদিকে, বিনপুর থানা কংগ্রেস কমিটি গঠনের একটা ইতিহাস আছে। কোন স্থানীয় ব্যক্তির দ্বারা গঠিত হয়নি এই কমিটি। কাঁথি মহকুমার বিহারীলাল পড়িয়ার উদ্যোগে গঠিত হয় এই কমিটি। বিহারীলাল এসেছিলেন বিনপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চাকরি করতে। ছিলেন জেলাবোর্ডের স্বাস্থ্য বিভাগের একজন স্বাস্থ্য-সহায়ক। কাজের সূত্রে তাঁকে যেতে হত শিলদা, লালগড়, দহিজুড়ি, কুই, কাঁকো, হাড়দা, সাহাড়ি প্রভৃতি জায়গায়। শুধু দপ্তরের কাজ নয়। স্বাস্থ্যবিভাগের কাজের সাথে তিনি করতেন আর একটি কাজ। এই কাজটি ছিল কংগ্রেস দলের প্রচার ও প্রসার। আর যেহেতু কংগ্রেস ও স্বাধীনতা সংগ্রাম তখন ছিল সমার্থক, তাই পরোক্ষভাবে বিহারীলাল বিনপুর থানায় বপন করেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ।

ঝাড়গ্রামের উত্তর থেকে দক্ষিণেও কংগ্রেস কমিটি গঠনের উদ্যোগ বিস্তৃতি লাভ করে অতি দ্রুততার সঙ্গে। এরই ফলশ্রুতি মহাপাল অঞ্চলে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন। বহু প্রভাবশালী এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি একত্রিত হন এই কমিটির ছাতার তলায়। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পাথরার বৈকুণ্ঠনাথ মাহাত, পদিমার পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ও কুমুদচন্দ্র দাস, পেটবিন্ধির উমেশচন্দ্র বাগ, কুশমাড়ের ডা: সাধু মজুমদার, বেলিয়াবেড়ার রাধানাথ পতি, গোপীবল্লভপুরের ধরণীধর দাস, কৃত্তিবাস দাস, রজনীকান্ত দাস, প্রফুল্লকুমার দুবে এবং সচ্চিদানন্দ অধিকারী, মহাপালের শ্রীনিবাস

দাস। মহাপাল অঞ্চল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে পূর্ণচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীনিবাস দাস। কয়েকজন সরকারী কর্মচারী এই কমিটির কাজে বাড়িয়ে দেন সাহায্যের হাত। এঁদের মধ্যে নাম করতে হয় শশীভূষণ দে এবং বরেন্দ্রনাথ মাইতির। শশীভূষণ ছিলেন সেই সময়ে গোপীবল্লভপুর থানার স্যানিটার ইনস্‌পেক্টর। বরেন্দ্রনাথ কাজ করতেন ঐ থানাতেই হেলথ্ অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে।

১৯২৯ সাল। অনুষ্ঠিত হতে চলেছে লাহোরে কংগ্রেস অধিবেশন। তারই প্রস্তুতি ও প্রচার চলছে সারা দেশে। ঝাড়গ্রামও পিছিয়ে থাকেনি এই অবস্থায়। আয়োজন করা হচ্ছে বিভিন্ন অঞ্চলে জনসভার। এই জনসভাগুলি অনুষ্ঠিত হয় গোপীবল্লভপুর, মহাপাল, পদিমা, বেলিয়াবেড়া, চোরচিতা, চন্দ্রী প্রভৃতি জায়গায়। জনসভায় বক্তব্য রাখছেন অনন্তকুমার মুখার্জী, বিহারীলাল পড়িয়া, কুমারচন্দ্র জানা প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ।

এল ১৯৩০ সাল। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি ঘোষণা করলেন অহিংস আইন অমান্যের এক নতুন কর্মসূচী। তারিখটা ছিল ১২ মার্চ। গুজরাটের সবরমতী আশ্রম থেকে শুরু হবে ব্রিটিশ বিরোধী এক অভিনব আন্দোলন। নাম ডান্ডি অভিযান। এই অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য বেছে নেওয়া হল ৭৮ জন আশ্রমবাসীকে। অংশগ্রহণকারীরা প্রতিনিধিত্ব করবেন সারা ভারতবর্ষকে। প্রতিনিধিদের মধ্যে একজন ছিলেন ঝাড়গ্রামের। তিনি ঝাড়গ্রাম মহকুমার গোপীবল্লভপুরের বাসিন্দা। নাম মতিলাল দাস। মহাত্মা গান্ধির একনিষ্ঠ অনুগামী ছিলেন মতিলাল। ডান্ডি অভিযানে তাই তিনি হয়ে উঠেছিলেন মহাত্মার খুবই কাছের মানুষ।

গোপীবল্লভপুর শুধু গুপ্ত বৃন্দাবন নয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই বৈষ্ণব পীঠস্থান উপেক্ষা করেনি সময়ের প্রয়োজনকে। মৃদঙ্গ-করতালের নাম সংকীর্তনের পাশাপাশি গোপীবল্লভপুরের যুবশক্তিকে দেখা গেছে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে। তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ ধনঞ্জয় কর। বারিপদা জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন তিনি। তারপর ১৯২১ সালে ভর্তি হন মেদিনীপুর কলেজে। কলেজে পড়াকালীন তিনি যুক্ত হয়ে পড়েন সশস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গে। সদস্য হন অনুশীলন সমিতির। ১৯৩১ সালে জেলাশাসক জেমস পেডির হত্যা, ১৯৩২ সালে জেলা শাসক রবার্ট ডগলাসের নিধন, ১৯৩৩ সালে জেলা শাসক বার্জের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে যায় ধনঞ্জয় করের নাম। বহু চেষ্টা চরিত্রের পর ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেপ্তার করে তাঁকে। বিভিন্ন জেলখানায় তাঁকে বন্দী জীবন কাটাতে হয় প্রায় দশ বৎসর। এই বন্দি জীবনের জন্য ধনঞ্জয়বাবুর ডাক নাম হয়ে যায় 'বন্দীবাবু'। অসম্ভব জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন ধনঞ্জয়। ১৯৪৭-এর পরে সারা ভারতে কংগ্রেস দলের একছত্র আধিপত্য। সেই সময়েও ধনঞ্জয় প্রদর্শন করতে পেরেছিলেন তাঁর ব্যক্তিত্বের যাদু। ১৯৫২ সাল থেকে পরপর তিনবার দাঁড়ালেন বিধানসভা ভোটে। কংগ্রেসের টিকিটে নয়। অকংগ্রেসী প্রার্থী হিসেবে। জয়ের হ্যাট্রিক করলেন তিনি। দল নয়, ব্যক্তিই বড় হয়ে উঠেছিল সেই সময় গোপীবল্লভপুরের

ভোটারদের কাছে।

১৯৩৭ সাল। পাশ হয়েছে ভারত সরকার আইন (Government of India Act)। সারা বাংলায় ঘোষিত হয়েছে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট। কংগ্রেস দল প্রার্থী দিয়েছে প্রতিটি কেন্দ্রে। এদিকে ব্রিটিশ সরকার উঠে পড়ে লেগেছে কংগ্রেস প্রার্থীদের পরাজিত করতে। তারা কংগ্রেস প্রার্থীদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে তাদের অনুগত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের। কংগ্রেস কমিটিকে অবৈধ ঘোষণা, ধর-পাকড়, ভীতিপ্রদর্শন, দমন-পীড়ন সবরকম পন্থা অবলম্বন করে ইংরেজ সরকার। ঝাড়গ্রামের মানুষ কিন্তু ভয় পায়নি তাতে। বিদেশী শক্তির রক্তচক্ষু এবং সমস্ত ধরণের শাসানি উপেক্ষা করে ভোট দেয় ঝাড়গ্রাম মহকুমার মানুষ। জয়যুক্ত করেন সব কংগ্রেস প্রার্থীদের।

ঝাড়গ্রামের জনসাধারণের এই নির্ভীকতাই বোধ হয় নেতাজিকে টেনে এনেছিল ঝাড়গ্রামে। ১৯৪০ সাল, ১২ মে। স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ শক্তির রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁকে ব্রিটিশ কারাগারে বন্দী থাকতে হচ্ছে মাঝে মাঝে। জেল থেকে স্বাস্থ্যের কারণে তাঁকে করা হবে বৃহবন্দী। গৃহবন্দী অবস্থায় ছদ্মবেশে অন্তর্ধানের ঠিক আগে ঝাড়গ্রামের মত এক অবহেলিত ও অনগ্রসর এলাকায় এলেন সুভাষ। ব্যস্ততা তখন তাঁর তুঙ্গে। স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে গান্ধিজির সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য এসে গেছে প্রকাশ্যে। সুভাষ বিভিন্ন জায়গায় করেছেন কর্মী ও জনসভা। মানুষকে বোঝাচ্ছেন। স্বরাজ পাওয়া যাবে না আপোষ নীতিতে। চাই ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম। এই উপলক্ষ্যেই সুভাষের ঝাড়গ্রামে আসা। ঝাড়গ্রামে কাটান সারাদিন। করেন একটি কর্মীসভা, আইনজীবিদের সঙ্গে একটি বৈঠক এবং বর্তমান দুর্গা ময়দানে একটি জনসভা।

সুভাষচন্দ্রের ঝাড়গ্রাম আসার পথ ছিল মেদিনীপুর তেকে ধেড়ুয়া হয়ে। কংসাবতী নদী পেরিয়ে যখন তিনি চাঁদড়ার দে-পাড়াতে পৌঁছান, একদল কীর্তনীয়া বন্দে-মাতরম বনি দিতে দিতে তাঁর গলায় পরিয়ে দেন মালা। চাঁদড়ায় তাঁকে মহিলারা করেন চন্দনচর্চিত। সঙ্গে ছিল শুভ শঙ্খ বনি। তারপর দহিজুড়ি এসে পৌঁছালে সুভাষচন্দ্রকে দেওয়া হয় বিশাল সম্বর্ধনা। দহিজুড়ির মানুষ নির্মাণ করেছিলেন 'শাসমল তোরণ'। সেই তোরণের প্রবেশদ্বারে দহিজুড়ির মহিলারা সুভাষের কপালে দেন চন্দনের ফোঁটা। আশীর্বাদ করেন ধান-দুর্বা দিয়ে। সমবেত জনতার অনুরোধে এখানে বক্তব্য রাখেন সুভাষ। বক্তব্যের নির্যাস— আপোষ নয়, স্বরাজ লাভ করতে হবে সংগ্রামের রাস্তায়।

সুভাষের মূল কর্মসূচী ছিল ঝাড়গ্রামে। আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন নেলিকো সিড্‌স্ স্টোর্সের মালিক নলিনবিহারী মল্লিকের। দুপুরবেলা সুভাষ করেন একটি কর্মীসভা। বিকেলবেলা বার লাইব্রেরিতে ঝাড়গ্রামের আইনজীবিদের সঙ্গে মিলিত হন সুভাষ। বার লাইব্রেরি থেকে তিনি যান দুর্গাময়দানে (তখনকার নাম লালগড় মাঠ)। তাঁকে স্বাগত জানানো হয় বাজি ফাটিয়ে এবং তুমুল জয় বনি দিয়ে। অনুষ্ঠিত হয় প্রকাশ্য জনসভা। প্রথমেই দুটি মানপত্র পাঠ ও প্রদান করা হয় সুভাষকে। তারপর শুরু হয় তাঁর দীর্ঘ বক্তব্য। সব কথার শেষ কথা ছিল একই। মহাত্মা গান্ধির আপোষ নীতিতে নয়, পূর্ণ স্বরাজ পেতে হলে চাই ত্যাগ ও সংগ্রামের পথ।

সুভাষচন্দ্রের জনসভায় যোগদানে বাধা এসেছিল তৎকালীন ঝাড়গ্রামরাজের দিক থেকে। রাজ এস্টেটের ম্যানেজার দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ফরমান জারি করেছিলেন সভায়, উপস্থিত না হওয়ার। ঝাড়গ্রামরাজ প্রতিষ্ঠিত কুমুদকুমারী ইনস্টিটিউশনের তৎকালীন প্রধানশিক্ষক রাধাশ্যাম বসু নাকি ছাত্র শিক্ষকদের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলেছিলেন সভায় না যাবার কথা। সমস্ত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করেছিল কিন্তু ঝাড়গ্রামের মানুষ। সুভাষচন্দ্রের সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন দলে দলে। ব্রিটিশরাজের অনুগত ঝাড়গ্রামের রাজাকে অশ্রদ্ধা না করলেও, ঝাড়গ্রামের জনগণ সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন স্বাধীনতার প্রকৃষ্ট পথ কোনটি। সেই পথ সুভাষের সংগ্রামের পথ। এর পরেও কি আমরা বলতে পারি স্বাধীনতার লড়াইয়ে ঝাড়গ্রামের মানুষ থেকে গেছেন নির্লিপ্ত উদাসীন ?

তথ্যসূত্র :

১। 'স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর'— বসন্তকুমার দাস।
২। 'অরণ্যসুন্দরী ঝাড়গ্রাম'— সম্পা. ড. বাবুলাল মাহাতো
৩। 'ঝাড়গ্রাম ইতিহাস ও সংস্কৃতি' — ড. মধুপ দে।

❁ — ❁ — ❁

ঔপনিবেশিক শাসনমুক্তির ডাকে নিমক ও জঙ্গলমহাল

ড. ছন্দা ঘোষাল

রাঢ় ভূখণ্ডের বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে লবণ প্রস্তুত হতো বলে মুসলমান ও ইংরেজ শাসনকালে এই রাজনৈতিক ভূখণ্ডগুলিকে নিমকমহাল এবং এর উত্তরাংশের বিস্তৃত পাহাড় ও অরণ্য বেষ্টিত অঞ্চলকে 'জঙ্গলমহাল' নামে আখ্যা দেওয়া হতো। এই মহালগুলির নামের শেষে 'ভূম' শব্দটির ব্যাপক প্রয়োগ এবং প্রচলিত কিংবদন্তীগুলি থেকে অনুমান করা হয় যে এখানে ভূমিজ জাতির বাস ছিল এবং এখানের রাজন্যবর্গ জনসাধারণের মধ্যে থেকেই উদ্ভূত। বাস্তবিক এইসব অরণ্যসংকুল ভূখণ্ডে জঙ্গল পরিষ্কার করে সর্বপ্রথম যারা মাটিতে চোট দিয়ে তাদের বসতির অধিকার এবং সীমা চিহ্নিত করেছিল তারাই ছিল গ্রামের প্রথম পত্তনদার খুঁটকাঠি। সেই গ্রামে প্রথম যারা বসতি স্থাপন করতো তারাই ছিল গ্রামের মাথা বা মুণ্ডা, মাঝি, মাহাত। পঁচিশ-তিরিশটা গ্রাম নিয়ে গ্রাম প্রধানরা নির্বাচিত করতেন নিজ নিজ গোষ্ঠীর পরগণাৎ বা পরগণা। ১২ টি পরগণা নিয়ে নির্বাচিত হতো দেশমণ্ডল। পরগণাৎ পদটি ছিল জন্মগত। এরাই নিজ নিজ এলাকার সামাজিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক বিধিনিষেধ আরোপ করতেন নিজ নিজ এলাকার মধ্যে। এদের কথা বা গ্রাম পঞ্চায়েতের কথা অমান্য করলে 'একঘরা', 'জলঘটি' বন্ধ প্রভৃতি সামাজিক বয়কটের সম্মুখীন হতে হতো সেই এলাকার যে কোনো গোষ্ঠীভুক্ত মানুষকে।

কিন্তু জঙ্গলমহালের এবং নিমকমহালের এই দেশীয় ব্যবস্থা চরম আঘাতপ্রাপ্ত হলো দুর্বল মোঘল শাসকদের কাছ থেকে যখন ইংরেজ বণিকরা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করলো। এর পূর্বেই অবশ্য ১৭৬০ সালে বাংলার নবাব মীর

কাশিমের কাছ থেকে বর্ধমান এবং চট্টগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে মেদিনীপুরের জমিদারীর খাজনা আদায়ের অধিকার যখন তারা লাভ করেছিল তখন থেকেই জমির মালিকানা স্থির করা অপেক্ষা খাজনা আদায় বৃদ্ধি করাকেই তারা মূল লক্ষ্য হিসেবে ধার্য করেছিল। ১৭৬৫ সালে টমাস গ্রাহাম মেদিনীপুর আসেন এবং হ্যারি ভেরেলস্ট নিযুক্ত হন রেভিনিউ বিভাগের সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট। ইংরেজ সরকার স্থানীয় রাজকর্মচারীদের প্রতি বছর মেদিনীপুরের মহালগুলি ঘুরে দেখতে বলেন। খাজনা বৃদ্ধি করার জন্য পতিত জমি বন্দোবস্ত দেওয়া এবং প্রাচীন জমিদার বংশের সঙ্গে জমা নির্ধারিত করার আদেশও দেওয়া হয়। বৎসরান্তে জমির খাজনা বৃদ্ধি, বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ধরণের মুদ্রার প্রচলন, বিভিন্ন মুদ্রাকে কলকাতার মান সম্মত মুদ্রায় পরিবর্তিত করার জন্য প্রচুর বাট্টার ব্যবস্থা- অর্থনৈতিক দুর্দশাগ্রস্ত জমিদারদের অবস্থা তাদের রায়তদের মতোই আরও দুর্দশাগ্রস্ত করে তুলেছিল। সহজেই তারা শহরস্থ বাবু মহাজন শ্রেণির ফাঁদে চড়া সুদে ঋণগ্রহণে বাধ্য হয়েছিল। ব্রিটিশ কোম্পানি স্থানীয় রাজকর্মচারী দেওয়ান, কানুনগো, তহশীলদারদের উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হতো দেশীয় জমি বন্দোবস্তের বিষয়ে। এই সুযোগে বহিরাগত শিক্ষিত উচ্চবর্ণীয় জমিদারি আমলা, দেওয়ান, নায়েব, কানুনগো, তহশীলদাররা প্রাচীন জমিদারদের সরিয়ে দিয়ে রাতারাতি জমিদারি গুলির অধিকাংশ এস্টেট নিজেদের নামে বেনামে কিনে নেয়। জঙ্গলমহালের জমিদারদের গ্রাম অঞ্চলে শান্তিরক্ষার ও খাজনা আদায়ের ভার ছিল পাইকবাহিনী ও তাদের সর্দার তহশীলদারদের ওপর। প্রজারা খাজনা দিত শস্যের মাধ্যমে, অর্থ দিয়ে নয়। গ্রামীণ কারিগর বা লবণের উৎপাদকেরা, গঞ্জের ব্যাপারীরাও পাইক সর্দারদের তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের মাধ্যমেই খাজনা দেওয়া পছন্দ করতো। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানি আল্লা সিক্কা মুদ্রাতে খাজনা আদায় নিতো, তাই প্রজাদেরও মুদ্রা সংগ্রহের জন্য বহিরাগত সুদখোর মহাজনদের দারস্থ হতে হলো। তাছাড়া পাইক ও সর্দারেরা তাদের জমিদারদের সেবার জন্য চাকরান জমি ভোগ করত। কিন্তু তাদের নিষ্কর জমির ওপরও খাজনা বন্দোবস্ত হয়ে গেল।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি সনদ লাভ করার পর ব্রিটিশ কোম্পানি জঙ্গমহালের যে সকল জমিদার খাজনা বন্দোবস্তে গররাজি হলো তাদের দমনের জন্য ফার্গুসনকে কার্তিকরাম ও চন্দন ঘোষ নামক দুজন বাঙালি গোমস্তা ও একদল সৈন্য সহ প্রেরণ করলো। রেসিডেন্ট গ্রাহাম পরামর্শ দিলেন প্রতাপশালী স্থানীয় জমিদারদের কঠিন

হাতে দমন করে তাদের শক্তির কেন্দ্র সমূহ সমূলে বিনষ্ট করে দিতে। ফলে জমিদারদের নিঃসম্বল করতে গিয়ে কোম্পানির সিপাহীরা নিরন্ন চুয়াড় রায়তদের ওপর বর্বর অত্যাচার শুরু করলো, প্রাণভয়ে জঙ্গলে পলায়নপর গ্রামবাসীদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বর্ষণ করতে লাগে। শহরাগত মহাজনদের অর্থনৈতিক শোষণ ও ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর সামরিক অত্যাচার জঙ্গলমহালের দরিদ্র মানুষগুলিকে সংঘবদ্ধ করলো। ১৭৬৭ সাল থেকে তারা তাদের সমব্যথী বিপন্ন জমিদারদের নেতৃত্বে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামে সামিল হলো। কল্যাণপুর, ফুলকুশমার জমিদাররা ইংরেজদের নিকট বেশি খাজনা দিতে রাজি হলেও ঝাড়গ্রামের জমিদার উগালষণ্ড মল্লদেব খাজনা দিতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু রাধানগর ও জামবনির সর্দার জমিদাররা ইংরেজদের নিকট আত্ম সমর্পণ করায় উগালষণ্ড মল্লদেবের আত্মসমর্পণ ছাড়া আর উপায় রইলো না। গরীব প্রজাদের উপর চলল ইংরেজ সিপাহীদের অকথ্য অত্যাচার ও লুণ্ঠন। বিপদ বুঝে রামগড়, লালগড়ের বৈষ্ণব জমিদাররা ফারগুসনের কাছে খাজনা কমাবার জন্য ব্যর্থ আবেদন করলেন। কিন্তু অম্বিকানগরের ডাকাত সর্দার দামোর সিং ইংরেজ সিপাহীরে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন বরাভূম, সুপুরের অন্য জমিদাররা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরাও প্রায় দুই হাজার আল্লা-সিক্কা মুদ্রায় খাজনা বন্দোবস্ত গ্রহণে রাজী হলেন। ঘাটশিলার জমিদার তাঁর রাজত্ব থেকে ইংরেজ কোম্পানিকে তাড়াতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাঁকে সাহায্য করতে অগ্রসর হলেন ভঞ্জভূম, বগড়ির জমিদাররা। বড় বড় শালের গুঁড়ি দিয়ে সব রাস্তা বন্ধ করা হলো, সাহায্য দিতে অগ্রসর হলেন দামোদর সিং। ফারগুসন ভেদ নীতি অনুসরণ করে ধলরাজাদের শত্রু জামবনির জমিদার মোগল রায়ের নেতৃত্বে সৈন্য পাঠায়। ধলরাজ পরাজিত হয়ে সামান্য মাসোহারা নিয়ে মেদিনীপুরে নির্বাসিত জীবন যাপন করে অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর ভাইপো কানু জগন্নাথ ধল নাম গ্রহণ করে ধলভূমের অধিপতি হলেন। ফারগুসন তাঁর সঙ্গে জমা বন্দোবস্ত করলেন যাতে তিনি ইংরেজদের অনুগত থাকেন। কিন্তু ইংরেজদের সামরিক ও মহাজনদের অর্থনৈতিক অত্যাচার ধলভূমের চুয়াড় প্রজাদের অন্তরে বিদ্রোহের আগুন জ্বালালো। ১৭৬৭র জুলাই মাসে জগন্নাথ ধলও সেই বিদ্রোহের সামিল হলেন। অন্যদিকে নাড়াজোলের জমিদার অযোধ্যারাম খাজনা দিতে অস্বীকার করে কর্ণগড়ের রানী শিরোমণির আশ্রয় লাভ করলেন। মংলাপোতার জমিদার লডডর সিং জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন। সি. কলিন্সের নেতৃত্বে দুই ব্যাটেলিয়ন সিপাহী কর্ণগড় আক্রমণ করলো। এই আক্রমণে বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করলেন। জমিতে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অধিকার কায়েম হলো। অন্যদিকে জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে অনেক জমিদার গায়ের জোরে তাঁদের আশ্রিত নায়েক, পাইকদের সাহায্যে প্রতিবেশী জমিদারদের ওপর হামলা করতে লাগলেন। ১৭৭৬ সালের অক্টোবরে বগড়িপরগণার রাজা যদু সিং প্রতিবেশী রাইপুর, সিমলাপাল প্রভৃতি জমিদারদের ওপর হামলা করতে লাগলেন। অন্যদিকে জগন্নাথ ধল জমিদারী হারিয়ে তাঁর অনুগত পাইকদের সঙ্গে নিয়ে ঘাটশিলা আক্রমণ করে ইংরেজদের ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। সুবলা সিং, কুলিয়া পাল, জাঘিন্দার প্রভৃতি পাইক সর্দারেরা জঙ্গলমহালের বিভিন্ন স্থানে অশান্তি ঘনীভূত করে তোলে। তারা কোম্পানির অধিকার অস্বীকার করে তাদের জমি জরিপ করতে দিতে অস্বীকার করে। ১৭৭৩ সালে পশ্চিম জঙ্গলমহালের

অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। ইংরেজ অধীনত কিংবা নির্বাচিত জমিদাররা এক পয়সাও খাজনা পাচ্ছিল না। ফলে শিলদার যে জমিদার একসময় কোম্পানির বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন সেই মানগোবিন্দ মেদিনী পর্যন্ত বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। কয়েকজন সর্দার মোহন সিং, লখিন দিগর বন্দী হয়ে জানালো তারা কোনো দিন খাজনা দেয়নি, তারা তাদের রাজাকে সেবা দিয়েছে। কোম্পানি সেবার পরিবর্তে চায় চাকরানি জমির খাজনা। ১৭৭৪-১৭৭৭ পর্যন্ত জঙ্গলমহালের সর্দাররা জমিদারের খাজনা বন্ধ করে দিল। লুঠতরাজ, হাঙ্গামা, অশান্তি চলতেই লাগলো। এই অবস্থা চরমে পৌঁছালে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ যখন, পাঁচশালা, দশশালার পরিবর্তে চিরস্থায়ী জমির স্বত্বদানের ব্যবস্থা করলেন। জঙ্গল ও নিমক মহালগুলিতে এর পরিণাম হলো মারাত্মক। খাজনা বেড়ে গেল। শহুরে বাবু জমিদাররা জমি হাতে রাখার জন্য গোপনে বিভিন্ন আয়ের পথ প্রশস্ত করলেন। ফলে সব আর্থিক দায়িত্বের ভার পড়লো দরিদ্র কৃষক ও গ্রামীণ কারিগরদের ওপর। মধ্যসত্বভোগী জমিদারী আমলা, তহশীলদার, মহাজনশ্রেণি প্রত্যক্ষভাবে মূল উৎপাদকের ওপর নির্বিবাদে আর্থিক শোষণ শুরু করলো। অনেকে জমি পত্তনী দিলেন। কিন্তু প্রজারা খাজনা দিতে না পারায় জমি থেকে উৎখাত হতে থাকলেন। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, গ্রামীণ শিল্পের দ্রুত অবনতি ভাগচাষীদের সর্বনাশ ডেকে আনল। এমতাবস্থায় ১৭৯৩-১৮০০ পর্যন্ত চুয়াড় ও পাইকদের বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করেছিল। ১৭৯৯ সালে ইংরেজ সরকার দৃঢ়হস্তে অশান্তি দূর করতে কৃতসংকল্প হয়। দেওয়ানি জজ জেলা কালেক্টরদের দোষারোপ করতে থাকেন। ফলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গ্রেগরিকে কলকাতায় ডেকে পাঠানো হলো এবং তাঁর জায়গায় কালেক্টর ইমহফ মেদিনীপুরের সর্বময় কর্তৃত্ব পেলেন। রায়পুর, শিলদা, সতপথী, মানভূম প্রভৃতি স্থানের অত্যাচারী দারোগা, তহশীলদারদের বরখাস্ত করা হলো। কর্ণগড়, বরাভূম, শিলদা, পাঞ্চেৎ প্রভৃতি বিক্ষোভের কেন্দ্রগুলিতে দ্রুত সৈন্য পাঠানো হলো। কর্ণগড়ের রানীকে আবাসগড় দুর্গে বন্দী রাখা হলো। নাড়াজোলের রাজা চুনীলাল খান এবং নারায়ণ বক্সী দেওয়ানকে মেদিনীপুর জেলে বন্দী রাখা হয়। ১৮০০ সালে বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করলো। চুয়াড়েরা নতুন নীলামদার জমিদারদের জমি আক্রমণ শুরু করে। এই বিদ্রোহ থামাতে অনেক ক্ষেত্রে খাজনা মকুব করা হলো। বিক্ষুব্ধ পাইকদের নিষ্কর জমি নামমাত্র জমায় ফিরিয়ে দেওয়া হলো। শান্তি রক্ষার ট্যাক্স মকুব করে সুপ্রাচীন জমিদারদের ওপর শান্তিরক্ষার ভার অর্পণ করা হলো। তাঁরা হিন্দু যুগ থেকে যে সব ঘাটোয়ালী অধিকার ভোগ করে আসছিলেন তা সবই বলবৎ রাখা হলো। রাজনৈতিক বন্দীদের ক্ষমা করা হলো। তবুও বিদ্রোহের আগুন সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়নি। ১৮৩২ সালে জঙ্গল মহালের নায়েক বিদ্রোহীরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়।

কিন্তু সেদিনের শহুরে শিক্ষিত ইংরেজ শাসনের সুবিধাভোগী বাবুশ্রেণীর কাছে জঙ্গলমহালের খেটে খাওয়া এইসব দুর্ধর্ষ জাতির বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে স্বাধিকার রক্ষার লড়াই কোনো সমর্থন বা সহানুভূতি পায়নি। তারা এগুলিকে নিছক নীচ জাতির স্বার্থরক্ষার লড়াই হিসেবেই প্রতিপন্ন করেছিলেন। তাই সেকালের প্রধান ধারার সাহিত্যে এদের গৌরবগাথার কোনো স্থান হয়নি। তবুও ১৮৯৭ খ্রীস াব্দে প্রবোধচন্দ্র সরকার তাঁর 'শালফুল' উপন্যাসে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বগড়ি

অঞ্চলের 'নায়েক বিদ্রোহে'র ইতিহাস অবলম্বনে এক চিত্তাকর্ষক কাহিনি রচনা করেছিলেন। এছাড়া এইসব করুণ রসের বীরগাথা চিরন্তন রূপ লাভ করেছে জঙ্গলমহালের লৌকিক সাহিত্যে।

যেমন—

১) শিলদার রানী কিশোরমণি / শিলদার ও কেশরানী / ইংরাজ সনে করিল লঢ়াই।
২) রাইপুরের জমিদার / জমিনের করে দাবিদার / ইংরাজ সনে লঢ়িল লঢ়াই।
৩) কুইলাপালের সুবলা সিং / কতেক বড় বীর / ধনুক ধইরে কইরছে লঢ়াই / দুনয়নে ইংরাজ মারে কাঁড়ে / চল যাব সোকইল আমরা চাঁড়ে।
৪) দামুদরের জমিদারী। ডাকাইতে কর সদ্দারী।। ব্রিটিশ রাজা কাঁপায় থরথর।
৫) গপাল মাঝি মহত মাঝি। লড়হাই করে গেলি।। সেই লড়হাইয়ে রাজার বেটা লীলামণিকে সঙ্গে পালি।।
৬) পাথর কাইটে খেত বনালি। বহালি আর বাইদ কানালি।। মহাজনে চাই যে ধুলা দিলহে। ল্যাখা পড়া নাই জানা ছিল।
৭) সাহেব আইল গুটিগুটি। ঝাড়খণ্ডে লীলকুঠি। ওগো লীল কুঠি লীল চাষে মরণ চাষার।

অন্যদিকে মেদিনীপুরের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলগুলি প্রতি পাঁচ বছরে একাধিকবার বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় কবলিত হয়। বন্যা, অতিবৃষ্টিতে কৃষির উৎপাদন কমে যায় এবং জমির উপর চাপ ক্রম বর্ধমান হয়। কৃষি অর্থনীতির এই অনিশ্চয়তা মেদিনীপুরের কৃষক সম্প্রদায়কে দারিদ্র্যের চরম সীমায় পৌঁছে দেয়। কৃষককুলের এই আর্থিক দুরবস্থা জনিত অসন্তোষকে রাজনৈতিক নেতারা-বিদেশী অপশাসনই এর মূলে বলে চাতুর্যের সঙ্গে প্রচার করতে থাকেন— যা জন সাধারণের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করে এবং সমস্ত রকম দুর্দশার জন্য তাঁরা ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থাকে দায়ি করতে থাকেন। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এইসব অসন্তোষ পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদের উন্মেষে ব্যাপক সহায়ক হয়েছিল। বাস্তবিক বাঙলার অন্যান্য অংশের তুলনায় মেদিনীপুরের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সচেতনতা বেশী ছিল বলেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এখানে অধিক সাফল্য লাভ করেছিল। মেদিনীপুরে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ তথা চরমপন্থী কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। তিনি মেদিনীপুর জেলা স্কুল-এর প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন ১৮৫১ সালে। এই সময় শিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগর একটার পর একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন। রাজনারায়ণ বসুও সেই আবহাওয়ায় নিজ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এলেন। পাশাপাশি মেদিনীপুরে ব্রাহ্মসমাজের প্রসারেও বড় দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন। এই পরিমণ্ডলেই বেড়ে উঠছিলেন তাঁর ভাইপো জ্ঞানেন্দ্রনাথ

বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং জামাতা প্যারীলাল ঘোষ। ১৯০২ সালে বরোদা থেকে বাংলায় এসে কলকাতায় গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা করলেন অরবিন্দ ঘোষ। তিনি রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র। মেদিনীপুরে এসে তিনি জেলা স্কুলের দুই শিক্ষক মামা জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও প্রখ্যাত চিত্রকর হেমচন্দ্র দাস কানুনগো এবং বয়ঃকনিষ্ঠ অপর মামা সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে নিয়ে মেদিনীপুরেও গুপ্ত সমিতি গড়ে তুললেন। বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য এভাবে কৈশোর- যৌবন উদ্বেল হয়ে উঠল। ছাত্র-যুবকদের আকর্ষণ করে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকেন সত্যেন। একাজে পাশে পেলেন তিনি ক্ষুদিরাম সহ একদল তরুণকে। বিপ্লবী আন্দোলন প্রবল গতি লাভ করল। ১৯০৫ সালে মেদিনীপুর, কোলকাতা সহ বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবীদের কার্যকলাপে আতঙ্কিত হলো ব্রিটিশ প্রশাসন। মেদিনীপুর শহর সহ দিকে দিকে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে ছাত্রসভা। ক্ষুদিরাম-সত্যেনের নেতৃত্বে মেদিনীপুরে বয়কট আন্দোলন প্রবল হয়। মেদিনীপুরের বেইলি হলে আপোষকামী নেতারা এই ভয়ঙ্কর আন্দোলনে রাশ টানতে চাইলে সভা ভেস্তে যায়। মেদিনীপুর টাউন হলের সামনে সত্যেন্দ্রনাথ বিপ্লবী ধারার কর্তব্য ঠিক করার জন্য সভা করেন। স্থির হয় বিপ্লবী আদর্শ প্রচার করা হবে। সংগঠনের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন কিশোর ক্ষুদিরাম। জেলা জুড়ে চলতে থাকে গুপ্ত সমিতির কাজ। এ ভাবে ক্ষুদিরাম উড়িষ্যার কটক পর্যন্ত পৌঁছে যান। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে দমন করতে চাওয়া কিংসফোর্ডকে হত্যার দায়িত্ব দেওয়া হলো ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকিকে। ৩০ এপ্রিল ১৯০৮ মজফফরপুরে কিংসফোর্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়েন ক্ষুদিরাম। কিন্তু গাড়িতে ছিল কিংসফোর্ডের স্ত্রী এবং কন্যা। কিংসফোর্ড বেঁচে যান। প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করেন। ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে যান। এই বোমা ব্রিটিশের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এই বোমা তৈরি করেছিলেন হেম কানুনগো। এই বোমা তৈরির ফরমুলা শিখতে চিত্রকলা শেখার অছিলায় তিনি প্যারিসে পাড়ি দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক বোমা মামলায় অরবিন্দ, বারিন ঘোষ, উল্লাস কর দত্ত, হেমচন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র, সত্যেন্দ্র— একে একে সকলকে কারারুদ্ধ করলো পুলিশ। মেদিনীপুর শহরে বাড়িতে বাড়িতে চললো— ভাঙচুর, ধরপাকড়, অত্যাচার। ক্ষুদিরামের ফাঁসি হলো ১১ অগাস্ট, ১৯০৮; নভেম্বরে ফাঁসি হলো তাঁর গুরু সত্যেন্দ্রনাথের।

১৯২৭ সালে দীনেশ গুপ্তকে মেদিনীপুরে পাঠালেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। তিনি ভর্তি হলেন মেদিনীপুর কলেজে। তরুণ আইনজীবী দাদার বাসায় উঠলেন তিনি বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের শাখা গঠনের উদ্দেশ্যে। লবণ আইন অমান্য ও ছাত্র ধর্মঘট দমনকারী পেডিকে শাস্তি দানের সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৩১ এর ৭ এপ্রিল পেডিকে হত্যা করা হয়। মেদিনীপুর জেলা স্কুলের একটি ঘরে গর্জে ওঠে বিমল, যতিজীবনের রিভলবর। পেডি হত্যার পর পুলিশ হত্যাকারীকে ধরতে না পেরে গোটা মেদিনীপুর শহরে বিশেষত ছাত্র-যুবদের উপর ব্যাপক অত্যাচার চালায়। পেডির উত্তরসূরী জেলাশাসক ডগলাস পুলিশ দিয়ে মেদিনীপুরে অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দেয়। ডগলাসের অত্যাচার সীমা ছাড়াল ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১, হিজলি জেলে। রাজবন্দীরা তখন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের জন্মদিন পালনের আয়োজন করেছিলেন। রাতের অন্ধকারে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে বন্দীদের হত্যা করলো পুলিশ। সন্তোষ মিত্র,

তারকেশ্বর সেন শহীদ হলেন, আহত হলেন অসংখ্য রাজবন্দী। প্রতিবাদে উত্তাল হলো সারা দেশ। তাঁর সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভায় রবীন্দ্রনাথ পাঠ করলেন তাঁর 'প্রশ্ন' কবিতাটি— "যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, / তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ?" বিপ্লবীরা ডগলাসকে চরম শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। দায়িত্ব নিলেন প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ও প্রভাংশু পাল। বেশ কয়েকবারের প্রয়াস ব্যর্থ হবার পর অবশেষে এক সভায় কড়া প্রহরার মধ্যে সাহেবি পোশাকে দুই কিশোর ঘরে ঢুকলেন এবং ডগলাসকে খতম করে পাঁচিল টপকে ছুটলেন। এটিও ছিল ১৯৩২-এর এপ্রিল মাস। রিভলবার কাজ না করায় প্রদ্যোৎ ধরা পড়ে যান। মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে ১২ জানুয়ারি, ১৯৩৩ প্রদ্যোতের ফাঁসি হয়। ফণীন্দ্র চন্দ্র, নরেন্দ্রনাথ দাস সহ ৩২ জন ছাত্র-যুবককে গ্রেপ্তার করে নির্মম অত্যাচার চালায় পুলিশ।

এরপর জেলাশাসক হয়ে আসেন বার্জ। তিনি শহরে চালু করেন কার্ড নীতি। তিন রঙের কার্ডের ব্যবস্থা করা হয়— সাদা, নীল, লাল। স্কুল কর্তৃপক্ষ, বাড়ি ও এলাকায় প্রত্যেক ছাত্রের খোঁজখবর নিয়ে তাদের গতিবিধির উপর নজরদারি চালিয়ে প্রত্যেকের বায়োডেটা তৈরি করে বার্জের পুলিশ। সেই মতো দেওয়া হতো কার্ড। সাদা সন্দেহমুক্ত, নীল সন্দেহ ভাজন এবং লাল ভয়ংকর। এদের প্রতি মুহূর্তে পুলিশী জেরার সম্মুখীন হতে হতো। ছাত্র-যুবদের সাইকেলে চড়া নিষিদ্ধ হলো। বার্জ মেদিনীপুরে রক্তগঙ্গা বওয়ালেন। কোনো অঘটন না ঘটে এপ্রিল মাস অতিক্রান্ত হলে বার্জ নিশ্চিত হয়ে ২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ মেদিনীর পুলিশ লাইনের মাঠে সতর্ক প্রহরার মধ্যে ফুটবল খেলা শুরু করলেন। গোল পোষ্টের দু-দিক থেকে ১৬-১৭ বছরের দুই কিশোর অনাথ বন্ধু পাঁজা ও মৃগেন দত্ত বার্জকে লক্ষ্য করে গুলি করতে করতে ছুটলেন। আকস্মিকতার ঘোর কাটিয়ে সান্ত্রীরাও তাঁদেরকে গুলি করে। শুরু হলো ধরপাকড়। ওই রাতেই ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায়, নির্মাণজীবন ঘোষ সহ ৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে আরো ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি প্রদান করা হয়।

এই বিপ্লবীধারার প্রভাব ১৯৪২-এর ভারতছাড়ো আন্দোলনেও পড়েছিল। তমলুক, কাঁথিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতীয় সরকার। পুলিশের গুলির সামনে বুক পেতে দিয়েছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা। তাঁর ডান হাতে গুলি লাগলে মাটিতে শুয়ে পড়েও তিনি বাঁ হাত দিয়ে দেশের পতাকা তুলে ধরেছিলেন। এর সঙ্গে নিমকমহাল-জঙ্গলমহালের অসংখ্য অনালোচিত, কম আলোচিত চরিত্ররাও মুক্তি আন্দোলনে আত্মদান করে দেশের, জাতির নতুন ইতিহাস রচনা করেছিলেন। তবে এই মুক্তি আন্দোলন নিয়ে যত প্রবন্ধ, ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছে সেই তুলনায় মূল ধারার সাহিত্য সেভাবে রচিত হয়নি। এর মধ্যে কেবল মূল ধারার দু'একটি সাহিত্যিক নিদর্শন যেমন, সুশীল জানার 'সাগর সঙ্গমে' উপন্যাসটি — এতে মেদিনীপুরের লবন

সত্যাগ্রহের বিষয়টি স্থান লাভ করেছে। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের প্রথম অঙ্কেও প্রচ্ছন্নভাবে কাঁথি-তমলুকের ভারতছাড়ো আন্দোলন, মাতঙ্গিনী হাজরার আত্মত্যাগ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর ৪২-এর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পটভূমিতে স্থান লাভ করেছে। এছাড়া রয়েছে কিছু লৌকিক ছড়া, গান— সেগুলিতে এই সব বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের টুকরো টুকরো ইতিহাস ধরা আছে। যেমন—

১) ছেঁদা পাথর গাঁ এক নাম / চইলে গেল ক্ষুদিরাম। / কামারে গঢ়িল হাঁথিয়ার।।
২) গান্ধীবাবু দিলেন যুগতি / পইরো না বিলাতি ধুতি। / চরকা দিয়ে সুতা কাট সবে এক মন। / বল সবে বন্দেমাতরম্।। / গাঁকে মেলেটার আইল। / সারা দেশটা লুইটে নিল। / চরকা দিয়ে সুতা কাট সবে একমন। / বল সবে বন্দেমাতরম্।।
৩) ইংরেজ রাজার ইংরেজ পলেসী। / জাগো জাগোরে ভারতবাসী।।
৪) গান্ধীজিকে দিলি জেহ্‌লে। / ওহে ন্যাতাজিকে কই পালে।।
৫) মাতঙ্গিনীর বুকেতে গুলি। / আস সবাই মিলে ফুল তুলি।।
৬) পেডি সাহেব মইরল। / ডমন মাহাতর জেহেল ভেল।। / ওগো সুরেনবাবু দ্বীপান্তরে গেল।
৭) ঝাড়গেরামের দুগ্‌গা মেলা। / সেদিন বিকাল বেলা।। / আইসে ছিল সুভাষ বসু হে। / হাজার লকের মেলা।।
৮) গুলি কইরে মরাবি মরা। / হাথে ফত্‌কা (পতাকা) আছে ধরা।।

গ্রন্থঋণ :

১) জনসংস্কৃতি সমাচার : (সম্পা.) শ্রী সৌমেন রায়
২) ঝাড়খণ্ডের বিদ্রোহ : পশুপতি প্রসাদ মাহাত
৩) ঝাড়খণ্ডী বাংলার ঝাড়গাঁয়ী রূপ : ছন্দা ঘোষাল
৪) মেদিনীপুর ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, ১ম ও ২য় খণ্ড : (সম্পা.) বিনোদশঙ্কর দাশ

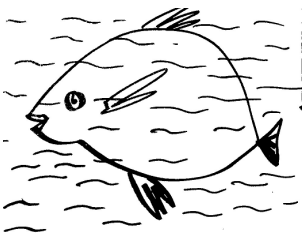

স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ ও আদিম জনজাতি

ড. শান্তনু পাণ্ডা

"...ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে ভারত ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে ? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে ? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন কি বিস্তীর্ণ কণ্টক শয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে।"– রবীন্দ্রনাথ

আজ থেকে ৭৫ বছর আগে আমাদের মুখে একটাই কথা উচ্চারিত হত— "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়।" তারপর একদল আনন্দের বন্যা নিয়ে এল— ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। লাল কেল্লায় শীর্ষে উড়লো অশোকচক্র শোভিত তেরঙ্গা পতাকা। এই দিন দেখার জন্য শত শত দেশবাসীর বুকের রক্ত উৎসর্গ করে, কত মা-বোনের সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলে আমরা পেয়েছি কি স্বাধীনতা ?— এটাই প্রশ্ন। পেয়েছি কি অধিকার ? আমরা কি জানি, কি আমাদের স্বাধীনতা ? কি আমাদের সম্পদ ? আমরা পিছিয়ে আছি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মূল্যবোধ, অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান। আমরা যা পেয়েছি— তার চেয়ে হারিয়েছি অনেক বেশী।

'আদিম জনজাতি' পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে 'স্বাধীনতা হীনতায় বেঁচে আছে' তারা বোঝে না কি স্বাধীনতা। জঙ্গলই তাদের জীবন। সকালে ঘুম থেকে উঠে যায় জঙ্গলে, কোলে থাকে শিশু, মাথায় থাকে ঝুড়ি ও কাটারী, হাতে থাকে পান্তাভাতের টিফিন কারি। তাদের সন্তানেরা জন্মানোর পর থেকেই প্রকৃতি নির্ভর খুব কম বয়স (৭-৮ বছর) থেকেই জঙ্গলে পাতা তুলতে যায়। না আছে তাদের বিদ্যালয়ে যাওয়া বা ICDS যাওয়া, না আছে ১৫ই আগস্ট তেরঙ্গা পতাকা হাতে কোন প্রাতিষ্ঠানিক আঙ্গিনায় দাঁড়ানো। স্বাধীনতার ৬৫ বছর পরও সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে ভারতে পরিবার পরিকল্পনায় ব্যর্থতা। জনসংখ্যা দূষণে আজ ভারতবর্ষ জর্জরিত। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী 'ইন্দিরা গান্ধী' বলেছিলেন জন্ম নিয়ন্ত্রণ হল স্বাধীন ভারতের উন্নয়নের চাবিকাঠি। ইংরেজ শাসনকালের বাঙলার শেষ নবাব মীর কাশিমের নিকট ১৭৬০ সালে মেদিনীপুর, বর্ধমান ও চট্টগ্রামের জমিদারী লাভ করে ইংরেজ কোম্পানি। মেদিনীপুরে প্রথম রেসিডেন্ট হয়ে আসেন 'জন মেটান'। ১৭৬২ সালে আসেন সেই পদে, আসেন 'বার্ডেট', জেলা অধিকর্তা হিসেবে। তারপর জমিদারী হস্তগত করে ইংরেজরা

জঙ্গলমহল আগ্রাসনে মনোযোগ দেয়। তখন জঙ্গল মহলের বিস্তীর্ণ এলাকা জমিদারদের অধীনে শাসিত হত। সিংভূম, বরাহভূম, মানভূম, ধলভূম, ঘাটশিলা, ঝাড়গ্রাম, রামগড়, লালগড়, ময়ূরভঞ্জ, কর্ণগড়, নাড়াজোল, কুলটিকরী, কিয়ারচাঁদ, জয়চণ্ডী, জামবনী, ভীমপুর, আররাগড়, গোপগড় ইত্যাদি। ঐ সময় শুধু ভারত দখল নয় পৃথিবীর নানা দেশ নিজেদের আধিপত্য বিচারের জন্য পৃথিবীর নানা দেশ নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য ফরাসিদের সঙ্গে ইংরেজদের দ্বন্দ্ব চলছিল। ইংরেজ কোম্পানি আয় বৃদ্ধির জন্য নানা পথ অবলম্বন করেছিল। আবাদি জমি, পতিত জমির খাজনা বন্দোবস্ত করে তা আদায় করার জন্য জমিদারদের ফরমান দিল। আর সেই সঙ্গে নানা দেশে চালান দিয়ে আয় করা শুরু করল। লোধা-শবর তথা জঙ্গলমহলের অন্যান্য মূলবাসী মানুষরা ইংরেজ কোম্পানির এই বড়বড় গাছ নিধন দেখে বিচলিত হয়ে উঠল। তাদের বিচলিত হওয়ার কারণ— এই জঙ্গল থেকে তারা খাদ্য আহরণ করে। এই সব গাছ গাছড়া থেকে তারা ঔষধ ব্যবহার করে, ঐ সব গাছের সঙ্গে তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হয়, ঐ গাছ ও জঙ্গল তাদের মাতৃসম এবং খোলা আবাসন। তাই তারা এই মাতৃসমা জঙ্গলের অধিকার বিদেশী শাসকদলের হাতে ছেড়ে দিতে রাজি হল না এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লাগাতার বিদ্রোহ শুরু করেছিল। তাই ব্রিটিশ শাসকরা 'কুশুআড়ি' নামে এক বিদ্রোহী লোধা নেতাকে ১৭৬৩ সালে খড়গপুরের কাছাকাছি এক প্রকাশ্য স্থানে গাছে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করেছিল এবং ঐ সময় ঝাড়গ্রাম এলাকার বিদ্রোহী সাতজন লোধা শবর নেতাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করেছিল। দেশবাসীর কাছে তারা আজও শহীদ হিসাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ঐ বীর শহীদদের হত্যাকাণ্ডের পর তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উক্ত দুটি স্থানের নাম দেওয়া হয় 'কেশিয়াড়ী' এবং 'লোধাশুলী' এখনও জঙ্গলমহলের মূলবাসী মানুষদের মুখে সেই বিদ্রোহের গান উঠে আসে —

"কেশু আড়ির ফাঁসি হৈল্য,
রঘুনাথ মাহাত বাঁধাই গেল
বাঁশ বনে ডম কানা
রাগে জ্বৈলছ্যে জঙ্গলে মহল খানা,

লোধা-শবরদের বারংবার বিদ্রোহ দমনে চরম অত্যাচার গৃহে অগ্নিসংযোগ, গ্রেপ্তার, কারাবাস, ফাঁসি দিয়েও তাদের বশ্যতা স্বীকার করানো যায়নি। ইংরেজদের সেনাবাহিনীতে তারা যোগ দেয়নি। এমনকি জমি ও জঙ্গল বন্দোবস্তের কোন কর দিতেও রাজি হয়নি তারা। বছরের পর বছর চেষ্টা করেও তাদেরকে বাগে না আনতে পেরে চরম ক্ষিপ্ত হয়ে ইংরেজ ইংরেজ সরকার লোধা-শবর জাতির কপালে লাগিয়ে দিয়েছিল Criminal Tribe Act (1871) এর তকমা— যাকে বলে অপরাধ প্রবন জাতি।

এই আইন পাশ ও চালু হওয়ার পর সভ্যতার সংস্পর্শে বসবাস করার অধিকার হারিয়ে অর্থনৈতিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে সুযোগ সুবিধা নিয়ে নিজেদের বিকশিত করার পথ হারিয়ে ফেলল এবং ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে থাকল। তারা নিজভূমিতেই পরবাসী হয়ে পড়লো। আবার ১৮৭২ সালে, Indian Forest Act-1872 চালু হল। এই বনাঞ্চল নীতি অরণ্য নির্ভর জীবনে অরণ্য অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদেরকে পূর্ণভাবে নিঃস্ব করে দিল।

এই আদিম জনজাতি গোষ্ঠী প্রকৃতি নির্ভর মানুষগুলি অতি প্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে জীবন যাত্রা নির্বাহ করত। তাদের জীবনযাত্রা হয়ে উঠল নির্মম, নির্দয় ও মমত্বহীন এবং নানা রোগ ব্যাধিতে ভুগে তারা ক্রমশ সংখ্যা লঘু হয়ে দেশের জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। শুরু হল তাদের বিকৃত সাংস্কৃতিক জীবন ও জীবিকা এবং জীবন যাত্রার মান আরও নিম্নমুখী। স্বাভাবিকভাবে অপুষ্টিজনিত কারণে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা শূন্যে চলে যাওয়ার নানা জটিল রোগে বহু সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত। যক্ষ্মা পঙ্গু, চর্মরোগ, পুষ্ঠ, রক্তাল্পতা, প্রভৃতি রোগ গ্রামের পর গ্রাম মানুষকে ছাপিয়ে গেছে।

স্বাধীন ভারতে লোধা কল্যাণ :

বিদেশী শাসকদের পরাধীনতা থেকে মুক্তহয়ে স্বাধীন ভারতে এক সংবিধান রচিত হয়। তাতে ড. আম্বেদকর সকল শ্রেণীর মানুষদের সংবিধানে স্থান দিতে চেষ্টা করেন। তাতে দেখা যায় সংবিধানে ২৭৫ (১) নং অনুচ্ছেদে লোধাদের সুরক্ষা ও উন্নয়নের কথা বলা আছে। তাই ১৯৫২ খ্রী: আয়েঙ্গার কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ভারত সরকার কর্তৃক Criminal Tribe Act মুছে – De-notified Tribe Act পাশ হয়। এবং এই আইন মোতাবেক Primitive Tribe Group (PTG) মানুষকে কোনভাবে পুলিশ সন্দেহ করে পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী অনুমানের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করতে পারবে না। এই আইনের ধারা হল ৭৫৯ (৩২)- TW/MC (WB) Date : 26.06.81। তাই পশ্চিমবঙ্গে টোটো, বীরহড় ও লোধা - এরা PTG- মানুষ হিসাবে গণ্য।

তাই ১৯৮১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জেলার অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া এলাকায় লোধাদের উন্নয়নের জন্য ঝাড়গ্রাম লোধা উন্নয়ন সেল স্থাপন করেন।

অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাঞ্চলে অর্থাৎ শুষ্ক মালভুমির লাল কাঁকুরে মাটি, বনাঞ্চল, অনুর্বর মেচহীন ভূমি এলাকায় লোধারা বাস করেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ বঙ্গের শেষ প্রান্তে পুরুলিয়া জেলার পাহাড়ের কোলে একই রকম ভূভাগে বাস করে 'বীরহড়'। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গে রয়েছে 'টোটো' উপজাতি। স্বাধীনতার পর ও লোধাদেরকে নানাভাবে অপরাধী বলে পুলিশ ধরে নিয়ে যেত। পুলিশ প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে না পেয়ে এদের প্রকৃতি, ব্যবহার, বাসস্থান, প্রবৃত্তি দেখে সন্দেহ করে ধরে নিয়ে যেতো। লোধারা জঙ্গল নির্ভর বৃহত্তর সমাজ থেকে পিছিয়ে থাকা বিচ্ছিন্ন উপজাতি। তাঁরা জঙ্গলের কাঠ, পাতা, ঝাটি, মূল, লতা, বাকল সংগ্রহ করতে গেলে জঙ্গল বাবুদের কবলে পড়ে হেনস্থা হতে

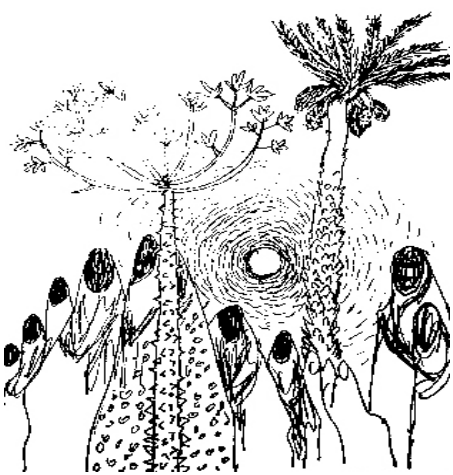

হয়। তাদেকে ধরে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করা হতো এমনকি তাদের সাইকেল কাড়িয়ে নেওয়া হত। ১৯৭৯, ১৯৮৩, ১৯৮৪, ১৯৮৫, ১৯৯৪, ১৯৯৭— এই বিভিন্ন সময়ে নয়াগ্রাম, নারায়ণগড়, কেশিয়াড়ী, ঝাড়গ্রাম এলাকায় প্রচুর লোধাকে হত্যা করা হয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গের ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলার পল্লির প্রাকৃতিক পরিবেশে তারা বাস করে। জীর্ণ কুঁড়ে ঘর, আগোছালো বাড়ীর ভিতর ও বাইরের পরিবেশ। পানীয় জল, রাস্তাঘাট, গৃহস্থালীর ব্যবহারের জলাশয় নেই বললে চলে। শিক্ষার পরিবেশ নেই, অস্বাস্থ্যকর বাড়ীর আশপাশ ও পরিবেশ চৌলাই মদের ঠেক, জুয়াড়ীদের আড্ডা, মাতালদের মাতলামী, অর্থনৈতিক দুরবস্থা চরম। চাষযোগ্য জমি নেই। যদিও কোন কোন পরিবারের জমি আছে বা পাট্টা পেয়েছে, তো চাষ করার জন্য লাঙল, গরু, জলের ব্যবস্থা ও চাষের অন্যন্য যন্ত্রপাতি নেই। এছাড়া অন্যান্য উপজাতিদের মতো এদের চাষের প্রতি ঝোঁকও কম। এরা চাষীদের বাড়ীতে চাষের সমস্ত কাজ করে মজুর হিসেবে নিজে চাষ করতে আগ্রহী নয়। এটা সবার মধ্যে নেই যেমন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় ব্লকের 'মকরামপুর', 'মেটাল', কেশিয়াড়ী ব্লকের 'কুঁকাই', 'সাতশোল', মেদিনীপুর সদর ব্লকের 'লোহাটিকারী', 'ফুলপাহাড়ী', ঝাড়গ্রাম জেলার 'শুশনিবেড়িয়া', বিনপুর-২ ব্লকের 'আশাকাঁথি' 'চাকাডোবা' নয়াগ্রাম ব্লকের 'সিংধুই', 'শালবন্দি ডেবরা', খড়গপুর, দাঁতন, পিংলা সবং ব্লকের কিছু কিছু লোধা কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত।

কিন্তু বেশির ভাগ লোধারা শিকার ও জঙ্গলে উৎপাদিত দ্রব্য সংগ্রহ করে। তাদের কাছে সরকারি সাহায্য সঠিকভাবে এবং সঠিক পদ্ধতিতে পৌঁছায় না। তারা অন্য উপজাতিদের মতো সরকারী - অফিসে যায় না কি তাদের পাওয়া ? কিভাবে তা পাবে ? কবে পাবে ? কোথায় পাবে ? কি পদ্ধতিতে আবেদন করতে হবে ? কি কি সরকারি পরিষেবা আছে — এ সমস্ত তারা জানে না।

সরকারি বহু প্রকল্পে তাদের বাড়ী করে দেওয়া হয়, কিন্তু বাড়ীগুলো তাদের বসবাসের উপযুক্ত নয়, তাদের মত অনুযয়ী তাদেরকে নিযুক্ত করে বাড়ী করে দেওয়া উচিত। তারা ভালো জানে তাদের কি রকম বাড়ী প্রয়োজন। তা না করে এক দরজা বিশিষ্ট চৌকো বাড়ি করে দেয় সরকার, না থাকে জানালা, না থাকে রান্নাঘর, না থাকে বারান্দা শুধু থাকে এক রুম বিশিষ্ট বাড়ী। স্বাধীনতার ৭৫ বছর অতিক্রম হওয়ার পরও ঠিকঠাকভাবে বসবাস করতে পারে না লোধারা। নেই বহু মানুষের আধার কার্ড, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, ছেলে মেয়েরা বিদ্যালয়ে যায় না। গত ২২শে জুলাই তারিখ ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর-২ ব্লকের শরিষাবাসা গ্রামে গিয়ে লেখক জানতে চাইলেন আধার কার্ড দেখাও। বলল, 'বাবু আধার কার্ড হয় নাই', কেন ? 'বাবু পাথর খাদানে কাজ করতে করতে হাতের রেখা সমান হয়ে গেছে, Finger Print আসে নাই'।

ঐ গ্রামে দেখলাম এক পরিবারে বাবা ও মেয়ে তেঁতুল ও লবণ দিয়ে ভাত খাচ্ছে। ঐ দিন ঢাঙ্গি কুসুম গিয়ে লেখকের একই অভিজ্ঞতা, একটি পরিবারে দুজন শিশু একজন মেয়ে (৫ বছর) একজন ছেলে (৭ বছর) শুধু লবণ আর ভাত খাচ্ছে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর এই দৃশ্য। তাই লোধাদের ঠিক সেভাবে উন্নয়ন হয়নি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয়জল, সরকারি বিভিন্ন পরিষেবা, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ,

জমি রাস্তাঘাত, বিদ্যুৎ, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, অর্থনীতি এই সমস্ত দিকগুলি খুবই দুরবস্থা। তাই তারা সমাজের মূল স্রোতে আসতে পারে না।

অন্যান্য উপজাতিদের মতো এরা সরকারি অফিসে যায় না, কি পরিষেবা আছে— কিভাবে তারা পাবে ? এটা জানতে যেমন সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজরা বিভিন্ন পঞ্চায়েত অফিসে যায় তারা উপজাতি হিসেবে সমস্ত সুযোগগুলি নিয়ে নেয়। লোধারা PTG-উপজাতি তো অবশ্যই কিন্তু অন্যান্যদের সঙ্গে কোন কিছুতে পেরে উঠে না। একটাই কারণ অশিক্ষা ও অজ্ঞতা। মাদকদ্রব্য সেবন হল আর এক ও অন্যতম কারণ যা তাদেরকে অনেকটাই পিছিয়ে রেখেছে।

তাই মাদকদ্রব্য সেবন বন্ধ করে শিক্ষার আঙিনায় এনে সচেতনতা বাড়িয়ে তুললে এই অপরাধ প্রবণ জাতি এবং আদিম জনজাতিকে সমাজের মূলস্রোতে আনা যাবে। আমরা স্বাধীনতা আনতে পেরেছি, কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে অধিকার দিয়নি।

আদিম জনজাতিদের স্বাধীনতা তাদের অধিকার।

❁ — ❁ — ❁

ঝাড়গ্রামে আদিবাসীদের বাহা পরব

সমীরণ দত্ত

দুহাজার সতের সালে চৌঠা এপ্রিল (৪ এপ্রিল ২০১৭) পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমাটিকে নিয়ে ২২ তম জেলা হিসাবে ঝাড়- গ্রাম জেলা গঠিত হয়। এখানকার বন-পাহাড়ীর বনভূমির সৌন্দর্য এবং বেলপাহাড়ির বিখ্যাত পাহাড়ের জন্য এক অতুলনীয় শোভায় শোভিত করে তুলেছে। জেলার উত্তরে কাকরাঝোড় বনভূমি এবং দক্ষিণে সুবর্ণরেখা নদী। বন্যপ্রাণীদের জন্য অভূতপূর্ব মনোরম বাসস্থান যেমন, তেমনি এখানকার প্রাচীন মন্দির, রাজ প্রাসাদ পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে একটি প্রিয় গন্তব্যস্থলের সুনাম অর্জন করে চলেছে।

সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য - লোক সংস্কৃতির অমূল্য ভান্ডার হল এই ঝাড়গ্রাম তথা জঙ্গলমহল। এখানকার মূলবাসী বা দেশজআদিবাসী অর্থাৎ

যারা বর্তমানে সেইসব লোকেদের বংশধর, যারা অনন্তকাল ধরে এই দেশের ভূখণ্ডে সামগ্রিকভাবে বা আংশিকভাবে বসবাস করত। যখন অন্য কোন কোনও সংস্কৃতি ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের লোকেরা পৃথিবীর অন্য কোন দেশ থেকে এসে ভিড় জমিয়েছিল এবং যুদ্ধে পরাজিত হয়ে স্থানীয় মানুষেরা অপ্রধান শ্রেণি হিসাবে ঔপনিবেশিক পরাধীন অবস্থায় বাস করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু কখনোই তারা বংশ পরম্পরার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করেন নি, সেই সমস্ত নীতি ও ভাবধারাকে লুপ্ত হতে দেননি। তারা এখনো নিজেদের বিশেষ সামাজিক কাঠামো, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রীতি- নীতি ও ভাবধারাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে হৃদয়ের অন্তস্থলে এবং মেনে চলে। তাইতো এখানকার অর্থাৎ ঝাড়গ্রাম তথা জঙ্গলমহলের মূলবাসীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে লোকনৃত্য, গীত, ছড়া- প্রবাদ, প্রমোচন, লোক-কথা, লোকবিশ্বাস এক স্বতন্ত্র সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। এখানকার লোকনৃত্যের মধ্যে ভুয়াং নৃত্য, চাং নিত্য, লাংরে নৃত্য, রায়বেঁশে নৃত্য, রণপা নৃত্য, ছৌ নাচ, পাতা নাচ

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লোকনৃত্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষক ডঃ সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেছেন-" ধ্রুপদী বা শাস্ত্রীয় নৃত্যের ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ শিক্ষা, দেহ-ভঙ্গিমার নিয়ন্ত্রিত প্রকাশ প্রয়োজন। লোক নৃত্যের বেলায় তেমন কোনও এ জাতীয় আয়াসসাধ্য শিক্ষার দরকার হয় না। তবে যথেচ্ছভাবে হাত-পা নাড়লেও লোকনৃত্য হয়না। এখানে শিল্পীরা নেচে নেচেই শিক্ষা লাভ করে। লোকনৃত্যের অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সুথবদ্ধতা, স্বতস্ফূর্ত, সহজ সাবলীল গোষ্ঠী চেতনার দ্যোতকরূপে লোকনৃত্যকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। "

লোকনৃত্যের জন্য কৃত্রিম মাচা বাঁধতে, আলো জ্বালতে বা পট ঝোলাতে হয় না। শিল্পীদের পায়ের তলায় থাকে অনাদৃত শ্যামল ভূমি মাথার উপর থাকে অসীম নীলিমা আকাশ। শিল্পী হয়তো সেখানে নিজেদের শিল্পী বলেই জানেনা। শুকনো ব্যাকরণের বাঁধা বচনও তাদের অজানা। নাচে তারা অচলায়তন থেকে মুক্তপ্রবল জীবনের আনন্দে এবং অঙ্গভঙ্গে, ছন্দে ছন্দে প্রকাশ করে সরল প্রাণের আশা-আকাঙ্ক্ষাই যেকোনও জাতির সত্তি কারের আত্মা খুঁজে পাওয়া যায় তার লোকনৃত্যে " । লোকনৃত্য প্রসঙ্গে প্রসাদ রায় একথা বলেছেন। লোক গানের মধ্যে ঝুমুর গান, টুসু গান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও লুপ্তপ্রায় লোকনাট্যের মধ্যে রয়েছে চড়িয়া চড়িয়ানী, ললিতা শবর পালা যা রাঢ় বাংলার লোক সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে। ঝাড়গ্রাম তথা জঙ্গলমহলের ঐতিহ্যশালী লোক উৎসবগুলির মধ্যে টুসু পরব, বাহা পরব, করম পূজা, ভাদু উৎসব, বাঁধনা পরব যা এই অঞ্চলের আকর্ষনের কেন্দ্রবিন্দু। এখানে নানা পার্বণ, আচার অনুষ্ঠান ধামসামাদলের দ্রিম দ্রিম বাজনার বোলে আবর্তিত জীবন যা ঝাড়গ্রাম তথা জঙ্গলমহলকে অনন্য করে তুলেছে।

আদিবাসীদের জীবন একেবারে সাধারণ। তাদের মন ও প্রাণ অত্যন্ত সরল প্রকৃতির। তাই তাদের বিশ্বাস নৃত্যের তালে ও গানের সুরে আছে ঈশ্বরীয় অমোঘ সারবস্তু ও ইন্দ্রজাল। যা দিনরাত্রি খেলে বেড়ায়। তাই তাদের সরল মনে বিশ্বাস সংসার জীবনে জীবনধারণের সকল ক্ষেত্রে এই অমোঘ শক্তিকে প্রয়োগ করতে পারলেই সকল ক্ষেত্রে তাদের মঙ্গল অনিবার্য। আর সেই কারণেই দেখা যায় আদিবাসীদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেকটি পূজা-পার্বণ, ব্রত অনুষ্ঠানে রয়েছে নৃত্য ও গীতের ব্যবহারের মাধ্যমে নৃত্যের ঝংকার আর সুরের মূর্ছনা।

বাহা পরব -

ঝাড়গাম তথা জঙ্গলমহলে আদিবাসী সাঁওতালদের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎসব "

বাহা " পরব ফাল্গুন মাসের দ্বাদশী তিথি থেকে আরম্ভ হয়। চলে ফাগুনের দোল পূর্ণিমার দিন পর্যন্ত। কখনো কখনো ক্ষেত্র বিশেষে দোল পূর্ণিমার পর আরও এক সপ্তাহ জুড়ে এই পরব পালন করা হয়। বাহা সাঁওতালদের পবিত্র ধর্ম বিষয়ক উৎসব। সাঁওতালি ভাষায় ' বাহা ' মানে ফুল। বাহা পরব তাই প্রকৃতি তথা ফুলের উৎসব, খুশির উৎসব। সাঁওতাল জাতি এমনিতেই খুবই উৎসবমুখর। এই জাতিই হল সত্যিকারের প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতির কোলেই তাদের জন্ম হয়, তারা বেড়ে ওঠে। প্রকৃতির কোলেই তারা মানুষ।

বসন্ত ঋতুর আগমনে শীতের শুষ্ক রুক্ষতা পেরিয়ে যখন প্রকৃতির রূপ লাবণ্যে ভরে ওঠে, যখন চারিদিকে সেজে ওঠে ফুলে ফুলে, হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় মনমাতানো গন্ধ, আকাশে উড়ে বেড়ায় রংবেরঙের পাখি। ঠিক তখনই ফাগুন হাওয়ায় মেতে উঠে ঝাড়গ্রাম তথা জঙ্গলমহল তথা এদেশের ভূমিপুত্র আদিবাসী সাঁওতালগণ। উৎসবের ভিতর দিয়ে প্রকৃতি দেবীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে পূজো করে পালন করে তাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব -' বাহা ' পরব তথা ফুলের উৎসব। শাল গাছে শাল ফুল ধরলে ঠিক হয় বাহা পরবের দিন। এই উৎসবে নির্দিষ্ট দিনে মারাং-বুরু কিংবা জাহের এয়ার সহ সমস্ত দেবতার থান গোবর দিয়ে নিকিয়েরাখা হয়। পুরুষের দল শিকারে বের হন। নির্দিষ্ট দিনে জঙ্গল থেকে কচিপাতা সহ শাল ফুলে ভরা ডাল সংগ্রহ করে আনা হয়। গ্রামের সবাই একত্রিত হয়ে অন্যান্য পরবের মতো বাহা পরবেও সুরের মূর্ছনায়, নৃত্যের ঝংকারে মেতে ওঠে। ধামসা, মাদল, ঘন্টা, বাঁশি, কেদরী, ব্যাগড় নাচগানের জন্য বিভিন্ন রকম বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। নৃত্যের তালে তালে গান গেয়ে বাহা উৎসব আরম্ভ করে-

১. "আস্ মিনাঃ অন্তর দুলোরঃ বাহা
লেগেঃ লেগেঃ
শাজাও আলাৎ ধারতি বাগানঃ
হয় রেঃ বাৎরিয়ার রাবাঃ
তলা লাৎ বাৎ তুপাগাৎঃ
হো হো হো হো হো"

২. "অকয় মায়চিয়ারা হো বির বিসম দ ?
অকয় মায় দহয় হো আতোরে পাঁয়রি ?
মারাং বুরুয়া চিয়ারা হো বির দিশম দ ,
জাহের এরায় দহয় হো আতোরে পায়রি। "

অন্যদিকে নায়কে (পুরোহিত) মশাই জাহের থানে গিয়ে দেবতাদের স্মরণ

করেন। যাতে তারা তাদের মাঝে উপস্থিত হন। আদিতে কিন্তু সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর এত বোঙ্গাবুরু অর্থাৎ ঠাকুর ছিল না, তারা একমাত্র ঠাকুর জিউরই সেবা করত। তাদের বিশ্বাস জিউরই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা- এ জগতের ঈশ্বর - জগদীশ্বর। এখনো তাই অনেকেই মাঝে মাঝে ' চান্দো বোঙ্গা ' বলে সেই ঠাকুর জিউরকেই স্মরণ করে। তাদের মাঝে মাঝে মারাংবুরু, জাহের এয়ার ইত্যাদি দেবতার আগমন ঘটে।

যাই হোক নায়কে মশাই দেবতাদের মিনতি করেন যাতে গ্রামের সকলের মঙ্গল হয়। সকলের কল্যাণ হয়। জায়ের থানে পুজা শেষে গ্রামে ফিরে আসেন। অন্যদিকে গ্রামের লোকেরা সকলেই তাদের নিজস্ব নিজস্ব জাহের থানে একত্রিত হয়ে শালফুলের পূজার্চনা করে। খুবই মজার ব্যাপার হল বাহা পরব শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউই নতুন পাতা, ফুল, ফল ব্যবহার করে না। এমনকি সাঁওতাল রমণীরাও খোঁপায় রঙিন ফুল দিয়ে নিজেদেরকে শোভা বদ্ধন, সৌন্দর্যমন্ডিত করে তুলে ধরতে পারেন না।

নায়কে (পুরোহিত) মশাই গ্রামে ফিরে আসার সময় জাহের থেকে কিছু শালফুল সঙ্গে আনেন। গ্রামের মেয়েরা প্রত্যেকের থালায় জল আর বাটিতে তেল দিয়ে নিজ নিজ বাড়িতে অপেক্ষা করে, নায়কে প্রত্যেকটি বাড়িতে যান। নায়কে মশাই বাড়িতে এলে প্রত্যেক মেয়ে নায়কে পা ধুয়ে তেল মাখিয়ে দেয়। নায়কে মশাই তাদের শালফুল দেন। তখন থেকে সারাবছর মেয়েরা শালফুল মাথায় বা খোঁপায় দিতে পারে আর কোন বাধা নিষেধ থাকে না।

বাহা পরব তিনদিন ধরে পালন করা হয়। নাচ- গান- ব্রত সবকিছু মিলিয়ে প্রতিটি সাঁওতাল পল্লী সর্বাঙ্গসুন্দর ও মনোগ্রাহী হয়ে এক অভূতপূর্ব মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি করে। বাহা পরব যেহেতু সাঁওতাল আদিবাসীদের ধর্মীয় উৎসব তাই এই পরবের গানে ধর্মীয় বিশ্লেষণের পাশাপাশি ইহকাল-পরকালের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ও সিদ্ধিলাভের কথা বলা হয়। নিরাকার তত্ত্বে বিশ্বাসী সাঁওতালদের এই পরবের গানে তাদের আরাধ্য দেবদেবীর সাজের বর্ণনাও আছে। বাহা পরবের রং বা আবিরের ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। শুধুমাত্র জল ছেটানোর ছাড়পত্র আছে। তাও আবার সম্পর্ক মেনে চলতে হয়। বাহা পড়বে গ্রামে সৌহার্দ্য পূর্ণ পরিবেশে সৃষ্টি হয় যেমন, তেমনই মানুষে মানুষে গড়ে ওঠে অনাবিল মধুর সম্পর্ক। ছেলেরা মাদল সহ অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজায়, মেয়েরা তালে তালে নাচে ও গান করে। কাকতলীয় ভাবে কথিত আছে কোন একদিন পবিত্র শালগাছের তলায় কোন এক বিচার সভা বসেছিল সত্যের সন্ধানে। শাল গাছের তলায় তার সত্যের সন্ধান পেয়েছিল। তাইতো শালগাছকে নিয়ে জাহের তৈরি হয়। সত্যের সন্ধানী শালগাছ কে " মৌরি সারজম " বলে সাঁওতাল আদিবাসীগণ আজও সম্মান করে আসছে বংশ পরম্পরায়।

তথ্যসূত্র ও ঋণস্বীকার :

১) বাহাপরব উইকিপিডিয়া
২) ঝাড়গ্রাম জেলা- উইকিপিডিয়া
৩) প্রচেষ্টা তৃতীয় সংখ্যা জানুয়ারি ২০২২
৪) বিভিন্ন ডেস্কটপ ও ফেসবুক কালচার।

পোড়া মাটির হাতি ঠাকুর - এক আদিম লোকবিশ্বাস

রাকেশ সিংহ দেব

আটের দশকের শেষের দিকে ঝাড়খণ্ডের দলমা অভয়ারণ্য থেকে হাতিরা নিয়মিত আসতে শুরু করে জঙ্গলমহলে। সেসময় দলমা পাহাড় থেকে নেমে আসত প্রায় পাঁচ থেকে সাতটি ছোট ছোট হাতির দল। নতুন জায়গায় এসে স্বাভাবিকভাবেই তারা জঙ্গল ছেড়ে বাইরে বেরোত না। শান্ত, নিরীহ প্রকৃতির এই হাতিরা আঁধার নামলেই সুযোগ বুঝে পাকা ধানের ক্ষেতে ঢুকে পড়ত। আবার দিনের বেলা লুকিয়ে থাকত জঙ্গলের নিরাপদ অন্তরালে। জঙ্গলমহলের ছাপোষা চাষিদের সঙ্গে সে ছিল 'হাতি ঠাকুর'-এর এক মজাদার লুকোচুরি খেলা। এলাকায় হাতি এলে মানুষ তা সৌভাগ্যের বার্তা বলে মনে করত। গ্রামে গ্রামে বাজত শাঁখ, দেওয়া হত উলুধ্বনি।

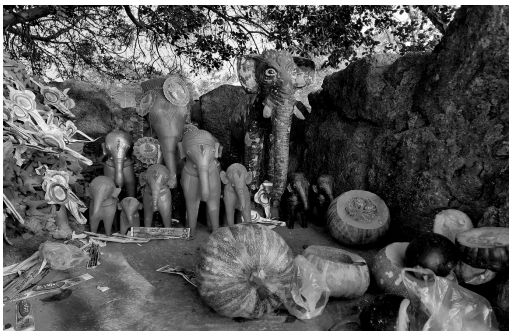

প্রথম দিকে কম সংখ্যক হাতি আসত, হাতিদের নিয়ে মানুষজনের উদ্বেগ তখন অনেক কম ছিল। মানুষজন সেসময় কৃষিজমি থেকে হাতিদের খেদানোর বিষয়টি উপভোগ করত। কৃষিজীবী মানুষজন বিশ্বাস করত, আগত হাতিরা মঙ্গলমূর্তির জীবন্ত কায়া। তাদের আগমনে এলাকায় শস্যসমৃদ্ধি বাড়বে। হাতিরা ফসল খেয়ে যা ক্ষতি করবে তার দ্বিগুণ ফিরে আসবে তাদের শুভ আগমনে। এভাবেই জঙ্গলমহল তথা দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক সংস্কৃতি এবং লোকগাথায় হাতি ঠাকুর এক শ্রদ্ধা ও ভালবাসার চরিত্র হিসেবে উত্তীর্ণ হয়েছে দেবত্বের আসনে। জঙ্গলমহল জুড়ে হাতিকে তাই শুধু হাতি বলেই ডাকা হয় না। তার শেষে "ঠাকুর" শব্দটা জুড়ে দিয়ে তাকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। "হাতিঠাকুর" বলেই তার নাম নেওয়া হয়। হাতির সঙ্গে এই "ঠাকুর" শব্দটা যেভাবে জুড়ে দেয়া হয়েছে তাতেই বোঝা যায় ভয় ও ভক্তি থেকেই এমনটা ঘটেছে। মৃত হাতিকে এলাকাবাসী সিঁদুর মাখিয়ে পুজোও করেন। পোড়ামাটি বা কংক্রিটের সিঁদুর মাখা মূর্তিতে বনভূমির রক্ষক ঠাকুর হিসেবে নিত্যপূজা হয় অনেক জায়গায়। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার এনায়েতপুরের কাছে রয়েছে বিখ্যাত হাতিধরা মন্দির। শালবনীর চন্দনকাঠ গ্রামে বসে বাৎসরিক হাতি মেলা। ঝাড়গ্রামের বরাশুলি গ্রামে রয়েছে হাতি ঠাকুরের থান। বিনপুরের সাতবাঁকি গ্রামে আছে হাতি ঠাকুরের থান। সমগ্র জঙ্গলমহল জুড়ে সম্মান আর শ্রদ্ধার সাথে জায়গা করে নিয়েছে হাতি ঠাকুর। জঙ্গলমহলের পথে-প্রান্তরে, গাছের তলায়, গ্রাম দেবতার থানগুলোতে দেখা যায় ছোট বড় অজস্র নানা আকার ও আকৃতির পোড়ামাটির হাতি ঘোড়ায় ভর্তি। সিঁদুর মেখে বছরের পর বছর স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো। দারুন এক আদিম গ্রাম্য হস্তশিল্পের নিদর্শন হিসেবে টেরাকোটার অপূর্ব কারুকার্যময়তায় তাদের গা থেকে

যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে বীরত্বের ভাব। কিন্তু কীভাবে তারা এল এই দেবস্থানে ? এই পোড়ামাটির হাতি ঘোড়াগুলি আসলে দেবতার থানে উৎসর্গীকৃত। দেব অনুকম্পায় 'মানত' বা মনের ইচ্ছেপূরণের আশায় ভক্তগন দেবতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার সাথে উৎসর্গ করেন পোড়ামাটির হাতি ঘোড়াগুলি। শুধুমাত্র 'মানত' নয়, কেউ কেউ পূজার অর্ঘ্য হিসাবেও ছোট ছোট হাতি ঘোড়া দান করে থাকে। কিন্তু এই জীব-জন্তু থাকতে কেন হাতি ঘোড়াই দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয় ?

এবিষয়ে থানের লায়া এবং বয়োঃজ্যেষ্ঠরা বলেন, আগেকার দিনে রাজা, শাসক ও বিত্তবানরা ছাড়া কেউ হাতি ঘোড়া রাখতে পারতেন না। বাড়িতে হাতি ঘোড়া থাকা ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। হাতির বিশালাকৃতি ও অসীম শক্তির কারণে প্রাচীনকাল থেকেই তার উপর দেবত্ব আরোপিত হয়েছে। মানুষের বিশ্বাস, দেবস্থানে

হাতি থাকলে গ্রামের কারও কোনও ক্ষতি হবে না। অনেকে বিশ্বাস করেন হাতি ঘোড়ায় চড়ে দেবতা গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। তাই প্রাচীনকাল থেকে দেবতাদের তুষ্ট করার জন্য তাঁদের উদ্দেশ্যে হাতি ঘোড়া উৎসর্গ করাকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচিত হত। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন মন্দিরে আজও হাতির উপস্থিতি চোখে পড়ে যা মন্দিরের সম্পত্তি হেসেবে বিবেচিত হয়। বর্তমানে 'ভারতীয় বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন ১৯৭২' লাগু হওয়ার পর থেকে সাধারণ মানুষের বিনা অনুমতিতে হাতি ঘোড়া ক্রয় বিক্রয় অসম্ভব হয়েছে। আজ সেই রাজাও নেই, আর নেই সেই রাজকীয় ঠাটবাট। কিন্তু তা বললে ঠাকুর মানবেন কেন ? তাই ঠাকুরকে তুষ্ট করার জন্য হাতি ঘোড়ার 'ছলন' বা প্রতীক হিসেবে পোড়ামাটির হাতি ঘোড়া উৎসর্গ করা হয়। 'ছলন' শব্দের অর্থ ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে দেখলে সংস্কৃত 'ছল' ধাতুর সঙ্গে অনট্ প্রত্যয় যোগ করলে ছলন শব্দটি পাওয়া যায়। 'ছল' শব্দের অর্থ কপটতা, প্রতারণা বা ধোঁকা। কিন্তু 'ছল' শব্দের আরেকটি অর্থ হল রূপ বা আকার। সেক্ষেত্রে ছলন শব্দের অর্থ হয় 'রূপক'। লোকসংস্কৃতির ভাষায় এই রূপক আর আদিবাসী জনজাতিদের বিভিন্ন টোটেম প্রায় এক। জঙ্গলমহলের লোকাচারের সঙ্গে এই টোটেম বা প্রতীক-পূজার সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন ও নিবিড়। জঙ্গলমহলের আদিম জনজাতি কুড়মিদের উল্লিখিত ৮১ টি গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম 'বানুআর' গোষ্ঠীর টোটেম হলো হাতি। এদেশের অনার্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে হাতির ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে সেই প্রাচীন আরণ্যক জীবনের আদিকাল থেকেই। জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে বসবাসের সূত্রে এরা হাতিকে কেবল নিজেদের কাজেই লাগায়নি, দেবতা রূপে পূজাও করে এসেছে। আধুনিক নৃতত্ত্ববিদগন মনে করেন, আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির টোটেম আসলে তাদের জীবনযাত্রার সাথে প্রকৃতির অন্তর্বর্তী সম্পর্ককে কেন্দ্র করে আবৃত হয়। এই

টোটেমের ধারনা তাদের সাথে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, পশুপাখি এবং প্রাকৃতিক উপাদানগুলির মধ্যবর্তী সম্পর্কগুলির সাথে যোগসূত্র রক্ষা করে। এভাবেই হাতি-ঘোড়া-বাঘ-সাপ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাণী হয়ে উঠেছে লৌকিক দেবদেবী তথা লৌকিক ধর্মাচরণের প্রতীক। সেই লোকবিশ্বাস মতে আজও দেব থানে মাটির হাতি ঘোড়া দেওয়ার প্রথা।

এই কারণে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া পুরুলিয়াতেও গড়ে উঠেছে হাতি ঘোড়া তৈরীর মৃৎশিল্প। পোড়ামাটির হাতি ঘোড়া নির্মাণ শুরু হয়েছিল পুজায় দেবতাদেরকে নিবেদনের উদ্দেশ্যেই। এখনও তাই হয়। বাঁকুড়ার পাঁচমুড়া গ্রাম তো আজ জগৎবিখ্যাত হাতি ঘোড়ার মৃৎশিল্পের জন্য। পরবর্তীকালে হাতি ঘোড়ার উপর অদ্ভুত সৌন্দর্যময় টেরাকোটার কাজ শুরু করেন শিল্পীরা। বিশেষ আকারের এই হাতিদের বলা হয় 'বোঙা হাতি'। 'বোঙা' শব্দের অর্থ হল অশরীরী শক্তি। দেবতা ও অপদেবতা দুই অর্থেই এটি ব্যবহার হয়। 'বুরু বোঙা' হলেন পাহাড় দেবতা, 'ডহর বোঙা' হলেন পথদেবতা, 'অড়া বোঙা' হলেন গৃহদেবতা। আদিবাসীদের ধারনায় সর্বত্র বোঙা বা ঐশ্বরিক শক্তির আবাস স্থান। মল্লভূমে সাঁওতাল উপজাতির বহু মানুষ বসবাস করে। তারা পোড়ামাটির কাজে খুবই দক্ষ। টেরাকোটার হাতি বানিয়ে সাঁওতালরা তাদের উপাস্য সূর্য দেবতা 'সিঞ বোঙা'-র কাছে উৎসর্গ করে। সেখান থেকেই 'বোঙা হাতি' নামটা এসেছে। শুঁড়ের দৃপ্ত ভঙ্গি, শরীরের কাঠামোয় আশ্চর্য সামঞ্জস্য, গায়ে গয়নার কারুকার্য সব মিলিয়ে এক বিমূর্ততার ছোঁয়া বোঙা হাতিকে অনন্য করে তুলেছে। আটপৌরে ঘরনার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে অভিনব হাতির অবয়ব। লোকশিল্পে বোঙা হাতির জন্ম তাই আঞ্চলিক আদিম আরণ্যক শিল্পকলার স্মৃতিবাহী। মৃৎশিল্পের এই উৎকর্ষতা সম্ভব হয়েছে লোকধর্মের কারণেই।

হাতি ঠাকুর একদিকে ভয়, অপরদিকে ভক্তির আধার। আজ ভক্তির মাধ্যমে ভয়কে জয় করার পন্থা অবলম্বন করেছেন জঙ্গলমহলবাসী। দিনের পর দিন ফসল ঘরবাড়ি তছনছ করে চলেছে হাতির দল, তবুও প্রথা মেনে বছরের এই সময়টা গ্রাম দেবতাদের পাশাপাশি হাতি পুজো করেন ভক্তরা। ইদানিং জঙ্গলমহলে হাতির দাপাদাপি বেড়ে যাওয়ায় হাতি ঠাকুরকে তুষ্ট করতে পূজার্চনাকে পন্থা হিসেবে আঁকড়ে ধরছেন কেউ কেউ। তাদের বিশ্বাস হাতি দেবতা স্বরূপ, হাতি ঠাকুরকে তুষ্ট করলে হাতিও মানুষের ঘরবাড়ি অনিষ্ট করবেন না। আর এই সরল বিশ্বাসেই তো মেলে ইষ্ট, তর্কে যিনি বহুদূর!

❁ — ❁ — ❁

শতবর্ষে ঝাড়গ্রাম : স্বাধীনতা সংগ্রাম

হরিপদ ঘোষ

নত্বহম্ কাময়ে রাজ্যম্ ন তুঃ স্বর্গম্ নঃ পুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাম্ প্রাণীনাং আর্তিনাশনম্।।
– শ্রী মদ্ভাগবত - ১ম স্কন্দ - ২১ অধ্যায় - ১২ শ্লোক।

শ্রী ভগবান বলেছিলেন — "আমি রাজ্য চাই না, পুনর্জন্ম ও স্বর্গসুখও চাইনা; আমি চাই দুঃখতাপে তাপিত মানুষের দুঃখ বিনাশ করতে।"

— মহাপুরাণের এই মহান বাক্যটি তাদের সম্পর্কে প্রযোজ্য; যারা প্রকৃত দেশপ্রেমী, প্রতিবাদী, স্বার্থত্যাগী এবং স্বাধীনতাকামী। অর্থাৎ যারা নিজের কথা না ভেবে দেশের মঙ্গল চিন্তা, মানুষের দুঃখ চিন্তা এবং সমাজের কল্যাণের কথা ভাবেন। আজ থেকে বহু বছর আগে যারা মানবকল্যাণের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করেছিলেন সেই জঙ্গলমহল তথা ঝাড়গ্রামবাসীদের আন্দোলনের কথা বলার চেষ্টা করছি। আজ থেকে ১০০ বছর আগে ১৯২২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী অখণ্ড মেদিনীপুর-এর অন্তর্গত গোপীবল্লপুর থানা, ঝাড়গ্রাম থানা এবং ভীমপুর (বিনপুর) নিয়ে গঠিত হয় নতুন ঝাড়গ্রাম মহকুমা। আজকের প্রতিবেদন — "স্বাধীনতা সংগ্রাম : শতবর্ষে ঝাড়গ্রাম"।

১৭৬৫ সালে ইস ইণ্ডিয়া কোং দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে দেওয়ানী সনদ লাভের পর অধিক খাজনা আদায়ে আগ্রহী হলে, এই কাজে সর্বপ্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় জঙ্গলমহল তথা ঝাড়গ্রামের রাজা ও প্রজারা। বাধ্য হয়ে ১৭৬৭ সালে কোং-কে সেনা অভিযানের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সেই থেকে শুরু হল ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঝাড়গ্রামবাসীদের অধিকার রক্ষার সংগ্রাম; যা প্রায় ৩৪ বছর ধরে জারি রেখেছিল। (১৭৬৭-১৭৯৯ সাল)

১৭৯৯ সালে বগড়ি থেকে সিংভূম, বরাভূম থেকে ময়ূরভঞ্জ পর্যন্ত সমগ্র জঙ্গলমহলে এই ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন ভয়ংকর আকার ধারণ করেছিল। এই সংগ্রাম মূলতঃ চাষী ও জমিদারদের সঙ্গে। এই আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই জঙ্গলমহলের পাইক সৈন্য; চাষী; মজুর ও সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করে। এটাই ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন। এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছিল কেবলমাত্র জঙ্গলমহলের অশিক্ষিত অসভ্য অধিবাসীরাই। তাই ইংরেজ তথ্যসংগ্রাহক ঐতিহাসিকরা এই সংগ্রামকে খাটো করে দেখানোর জন্য এই বিদ্রোহকে 'চুয়াড় বিদ্রোহ' আখ্যা দেয়। কিন্তু আমার মনে হয়, এটাই ছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঝাড়গ্রাম তথা দেশজ মানুষের 'অধিকার অর্জনের প্রথম সংগ্রাম'।

সুশিক্ষা আনে রাজনৈতিক চেতনা, চেতনা আনে সংগ্রাম; আর সংগ্রাম আনে পূর্ণ স্বাধীনতা। যা ঝাড়গ্রামবাসী তৎকালীন যুগেও মর্মে মর্মে অনুভব করেছিল। তাই ১৭৯৯ সালে শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা জমির উপর

কিছুটা অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে, সে যাত্রায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।

মহাত্মাগান্ধীর নেতৃত্বে বিশ শতকের গোড়ায় যে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, তাতে ঝাড়গ্রামবাসীও অংশগ্রহণ করেছিল। ইতিহাসের ছেঁড়া পাতায় তা ধূসর মলিন। অবহেলিত, উপেক্ষিত, ঝাড়গ্রামের কোনো উল্লেখ নেই। ৩৪ বছর ধরে যে ভূখণ্ডের মানুষেরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল; ইতিহাসের পাতায় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিবাদী বিপ্লবী হিসেবে তাদের নাম নেই।

১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ গান্ধীজীর নেতৃত্বে ডাণ্ডি অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন ঝাড়গ্রাম মহকুমার গোপীবল্লভপুরের মতিরাম দাস।

স্বাধীনতা সংগ্রামী বসন্তকুমার দাস 'তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর' গ্রন্থে বলেছেন— "অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২১) প্রবল তরঙ্গে মেদিনীপুর জেলাতে যে বিপুল জাগৃতির সৃষ্টি করেছিল ১৯২২ সালে সৃষ্ট ঝাড়গ্রাম মহকুমাতে কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন দীনেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়, গদাধর মণ্ডল— সক্রিয় সদস্য (রগড়া নিবাসী)। অন্যান্য সদস্য - তারাপদ দে, অবিনাশ চন্দ্র সেনগুপ্ত (ঝাড়গ্রাম)।"

বসন্তবাবুর বিবরণে ১৯০২ সাল থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় মেদিনীপুর জেলায় বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা হয়। বিপ্লবী কর্মীরা বাঁকুড়ার ফুলকুশমার (বারিকুল থানা বর্তমানে) ছেঁদাপাথরে পাহাড়ের গুহা, ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রাম থানার রামেশ্বর মন্দিরের তপোবনের নির্জন পরিবেশে বীর বিপ্লবীরা গোপনে রিভলবার চালানোর প্রশিক্ষণ নিতেন।

১৯২২ সালে (শতবছর আগে) স্থানীয় জমিদাররা কর নির্ধারণের চেষ্টা করেছিল। বিভিন্ন করের (Tax) বিরুদ্ধে সমস্ত ঝাড়গ্রাম জুড়ে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন জাম্বনীর গিধনীর শৈলজানন্দ সেন; মহেন্দ্রনাথ মাহাতো (মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র (ঝাড়গ্রামের ভূমিপুত্র), পরে মেদিনীপুর কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ও জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান) এবং সাতকড়ি পতি রায় (কলকাতা হাইকোর্টের Advocate)।

১৯২৪ সালে বেলেবেড়া গ্রামের গোপীনাথ পাত্র মেদিনীপুরে উকিল হিসেবে এসে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের অনুপ্রেরণায় কংগ্রেস দলের সদস্য হন। লোকাল বোর্ডের নির্বাচনে গোপীবল্লভপুর থানার কংগ্রেস প্রার্থীরূপে ময়ূরভঞ্জ রাজার ম্যানেজার দ্বিজদাস ভাদুড়ীকে পরাজিত করে ঝাড়গ্রাম লোকাল বোর্ড থেকে মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী সারা ভারতবর্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে স্বাধীনতার সংকল্প বাক্য পাঠ হয়। এই উপলক্ষে বিনপুর থানার পাশের মাঠে একটি বিরাট জনসভা হয়েছিল। সভার আগে একটি শোভাযাত্রা হড়িদা, কুই, কাঁকো ও বিনপুর ঘুরে সভাস্থলে আসে। সেখানে শপথ বাক্য পাঠ করান বিহারীলাল পড়্যা মহাশয়। বিহারীবাবু এবং ভলু সেখ সমগ্র ঝাড়গ্রাম জুড়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যে নেতৃত্ব দেন। অবশেষে গুপ্তচরের কাছে খবর পেয়ে দুজনকে বিনপুর থানার পাশের গ্রাম নয়াগ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করে।

গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর নতুন উদ্যমে জেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। মেদিনীপুর জেলার নতুন কমিটিতে ঝাড়গ্রাম মহকুমার সংগঠন পরিচালনার দায়িত্ব পান— রমেশ চন্দ্র কোঙার এবং গোপীনাথ পতি।

১৯৩১ সালে উড়িষ্যার কংগ্রেস নেতারা উড়িষ্যাকে বিহার থেকে পৃথক করে; মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম, ঝাড়গ্রাম, দাঁতন, কেশিয়াড়ী, মোহনপুর কাঁথি, এগরা, রামনগর, দীঘা সহ থানাগুলিকে উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত করার দাবি করেন। এর প্রতিবাদে ১৪ই জুলাই কাঁথি শহরে বিরাট প্রতিবাদ সভা হয়। বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে সভাপতি করে মেদিনীপুর বিচ্ছেদবিরোধী কমিটি গঠিত হয়। গিধনীতে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাশয়কে বিরাট সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। জীবনকৃষ্ণ মাইতি মেদিনীপুর বিচ্ছেদ বিরোধী কমিটির সহ সভাপতি ও ত্রৈলোক্যনাথ পাল মহাশয়কে সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। তখন গান্ধীজি লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে ছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল গান্ধিজিকে এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে তার বার্তা পাঠিয়ে তখন মেদিনীপুরকে দ্বিখণ্ডিত করার চেষ্টা বন্ধ করতে অনুরোধ জানান। কারণ দুই প্রদেশের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগতঐক্য নেই। এর জন্য সামুয়েল - ওডোনেল কমিটি বসে মেদিনীপুরে ১৯৩১ সালের ৮ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করে।

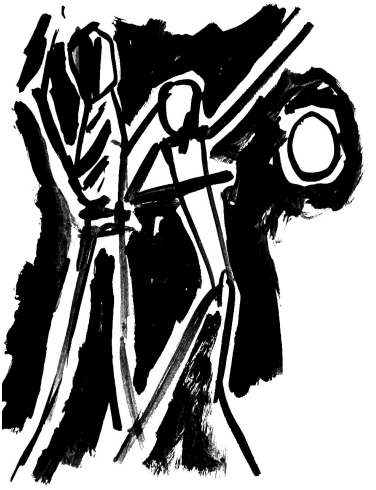

এই কমিটির সামনে উড়িষ্যাভুক্তির পক্ষে বলেন— মেদিনীপুরের অন্যতম উকিল ভাগবত চন্দ্র দাস সহ কয়েকজন। বিপক্ষে বলেছিলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল সহ প্রায় ২৮ জন স্বনামধন্য ব্যক্তি। ১৯৩২ সালের ১৮ই এপ্রিল উক্ত কমিটি বলে মেদিনীপুর ও বিহারের সিংভূমের কোনো অংশ নতুন উড়িষ্যা প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হবে না। এই ঐতিহাসিক রায়ে সারা মেদিনীপুর জেলা উল্লাসে ফেটে পড়ে। ফলে ঝাড়গ্রাম মহকুমার ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর ও নয়াগ্রাম বাংলার সঙ্গে থাকতে পেরেছে।

১৯৩৭ সালে ভারত সরকার বাংলা বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা করে। ভারত সরকার প্রত্যেক কংগ্রেস প্রার্থীর বিপক্ষে এদেশীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রার্থী করে। কংগ্রেসের জনপ্রিয় নেতা দেবেন্দ্র লাল খানের বিপক্ষে দাঁড়ান রায়সাহেব শম্ভু চরণ দত্ত; কংগ্রেস নেতা কিশোরীপতি রায়ের বিপক্ষে দাঁড়ান ঝাড়গ্রামের রাজা। ইংরেজ সরকার কংগ্রেস কমিটিকে অবৈধ ঘোষণা করে। কিন্তু নির্বাচনে এই জেলার মানুষ তথা জঙ্গলমহলের মানুষ বিদেশী শাসকের চোখরাঙানি ও শাসানিকে উপেক্ষা করে ভোট দিয়ে কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়ী করেন।

এই সময়ে (১৯৪০) সুভাষচন্দ্র বসু ও গান্ধীজির মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে-

সুভাষচন্দ্র বিভিন্ন স্থানে কর্মী সভা করেন। ১৯৪০ সালের ১১ মে শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে ট্রেনে মেদিনীপুরে আসেন। নাড়াজোল রাজার অতিথি হিসেবে গোপপ্রাসাদে (বর্তমান গোপ কলেজ) নিশি যাপন করেন। পরের দিন সকালে (১২ মে) রবিবার রাজকুমার দেবেন্দ্রলাল কান ও কংগ্রেস কর্মী। রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সঙ্গে মোটর গাড়িতে চেপে ধেড়ুয়া হয়ে ঝাড়গ্রামে আসেন। ধেড়ুয়াতে কংসাবতী নদীতে লোহার বোটে মোটর গাড়ি পার করে বৈতা ঘাটে উঠে নেতাজী দহিজুড়ি হয়ে ঝাড়গ্রাম এসেছিলেন। দহিজুড়িতে সুভাষচন্দ্রকে অভ্যর্থনা জানাতে বিশাল তোরণদ্বার নির্মিত হয়; জনতার অনুরোধে সেখানে ভাষণে বলেন— আপোসের দ্বারা নয়; ত্যাগ ও সংগ্রামের পথেই স্বরাজলাভ করতে হবে।

ঝাড়গ্রামে পৌঁছে নেতাজী দুপুরে একটি কর্মীসভা করেন। পরে লাইব্রেরীতে আইনজীবীদের সাথে মিলিত হন। বিকেলে বর্তমান দুর্গাময়দানে (তৎকালীন লালগড় মাঠে) প্রকাশ্য জনসভায় বক্তব্য রাখেন নেতাজী। সভায় আতসবাজি পুড়িয়ে বিপুল জয় বনি দিয়ে গান গেয়ে নেতাজীকে মানপত্রসহ সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। তিনি বলেছিলেন — ব্রিটিশের পদ সেবা নয়; আপোষের দ্বারা স্বাধীনতা নয়, "ঝাড়গ্রাম চায় ত্যাগ ও সংগ্রাম দ্বারা পূর্ণ স্বরাজ"। ভারতবর্ষে প্রথম ব্রিটিশ বিরোধীতার গৌরব জঙ্গলমহল ঝাড়গ্রামেরই প্রাপ্য। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের 'কালের কপোসতলে "জঙ্গলমহল তথা ঝাড়গ্রামের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন" শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। জঙ্গমহল ঝাড়গ্রাম এর জয় হোক- কামনা করি।

যতদিন চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্র থাকবে ততদিন ঝাড়গ্রামবাসীর কথা বাঙালির হিয়ায় গাঁথা থাকবে। কারণ, বহু শ্রম ও প্রচেষ্টা, মনোবল, রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে সার্থক হয়েছে সংগ্রাম। তাই শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করি— "শতবর্ষে ঝাড়গ্রাম : স্বাধীনতা সংগ্রাম।"

তথ্যসূত্র :

১. ড. মধুপ দে— "ঝাড়গ্রাম — ইতিহাস ও সংস্কৃত"।

❁ — ❁ — ❁

গ্রন্থাগার

হরিশঙ্কর দে

আমি গ্রাম বাংলার ছেলে। গ্রামের গ্রাম্য প্রকৃতি, পরিবেশ, মাটি-ধুলো-বালি প্রভৃতির মধ্য দিয়েই বড় হয়ে ওঠা। একটি-একটি করে ধাপ এগিয়ে যাওয়া মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক-স্নাতক-আপাতত এখানেই দাঁড়ি দেওয়া যাক। পরে বলব আরও। যে কথাটা বলার তা হল লাইব্রেরি নিয়ে। বর্তমানে আমার দেখা কয়েকটি লাইব্রেরি থেকে ধারণা জন্মেছে কিছুটা এই রকম 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' ঠিক এর সমান্তরালে বলা যায় 'বই ঢেকে যায় ধুলোর আস্তরনে'। এর কারণ পাঠক সংখ্যা কম নাকি পরিচর্যা করার লোকের অভাব নাকি মানসিকতার অভাব তা পরে আলোচনা করা যাবে।

গ্রাম্য পরিবেশে মানুষ, সুতরাং লাইব্রেরির সাথে পরিচিত হয়ে উঠতে পারিনি।

কিন্তু আমার স্নাতক-পড়ার সময় গড়ে ওঠে লাইব্রেরির সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। যদিও পরিচিত হওয়ার মানসিকতা কতখানি ছিল তা এই মুহূর্তে দাড়িয়ে বলা যায় না। তবে বলা যায় তখনের খাওয়ার খরচ কমানোর কথা। বাঁকুড়ার কেঁদুয়াডিতে একটি মিশন রয়েছে 'কেঁদুয়াডিহি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম' যেখানে পাঁচ টাকায় তখন দুপুরের খাওয়ার পাওয়া যেত তবে শর্ত ছিল— প্রথমত, কোন না কোন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বা ছাত্রী হতে হবে আর দ্বিতীয়ত, সেখানের লাইব্রেরিতে বসে দু'ঘণ্টা বই পড়তে হবে তা সে যে কোনো বই হতে পারে। তবেই মিলত পাঁচ টাকায় দুপুরের আহার। স্বাভাবিকভাবে খাওয়ার জন্য লাইব্রেরিতে দু'ঘণ্টা পড়তেই হত। সেখানে থেকেই তৈরি হতে থাকে লাইব্রেরির অভ্যেস। কখন যে সে সময়ে বাঁধা নিয়ম দু'ঘণ্টা-চার-পাঁচ ঘণ্টায় পরিণত হয়ে গেছে তা ঠিক বলা যায় না— নিজের অজান্তেই ঘটে গেছে। ক্রমে ক্রমে লাইব্রেরি আমাকে তার কাছে টেনে নিতে আরম্ভ করে।

এরপর সালটা ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ; কপালগুণেই বলা যায়, ভর্তি হই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিষয়ে স্নাতকোত্তর পড়ার জন্য। সেখানে পাই বেশ বড় ধরণের লাইব্রেরি— সেন্ট্রাল লাইব্রেরি। সুযোগের সদ্-ব্যবহার করতে থাকি। বাঁকুড়ার কেঁদুয়াডিহি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের লাইব্রেরি যে অভ্যাস গড়ে দিয়েছিল তা পূর্ণতা পায় সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে গিয়ে। ক্রমে সময়ের সাথে সাথে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করি। পরে বি.এড. এর জন্য বর্ধমানে আসতে হয়। সেখানে এসেও লাইব্রেরির খোঁজ করি। প্রথমে যাই বর্ধমান রাজ কলেজের লাইব্রেরিতে কিন্তু সদস্য হতে পারিনি ফলে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরির দ্বারস্থ হতে হয়। সদস্য পদ পাই। সেখানেও চলতে থাকে পড়াশোনা, শেষ হয় বি.এড.। এর পরই NET অর্থাৎ National Eligibility Test (NTA, UGC) পাশ করি। পুনরায় ফিরে আসি নিজের বাড়ি ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর থানার অন্তর্গত ষাঁড়পুরা গ্রামে। তৈরি হতে থাকি Ph.D এর Interview এর জন্য— ফলে প্রথম থেকেই বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বই কিনে উঠতে পারিনি, পারিনি সব বই যোগাড় করতেও। ফলত আমাকে ঝাড়গ্রামে আসতে হয়। সেখানে সাহায্য পাই আমার শিক্ষক ড. ফটিক চাঁদ ঘোষ মহাশয়ের কাছে। পরে তিনি আমাকে যেতে বলেন কবি কৌশিক বর্মনের কাছে। সেখান থেকে পাই 'সাহিত্যের আড্ডা' যা প্রতি মঙ্গল ও শনিবার বসে পান্থসখা-তে। এরপর কৌশিক বাবুর কাছে খোঁজ নিই লাইব্রেরির। তিনি আমাকে ঝাড়গ্রামের তিনটি লাইব্রেরির সন্ধান দেন— (১) বলাকা গ্রন্থাগার, (২) আলাপনী গ্রন্থাগার, ও (৩) দ্বিজেন্দ্রনাথ গ্রন্থাগার। তারপরই আমাকে চরম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়।

এখন প্রশ্ন চরম অভিজ্ঞতা কি এবং কেন? আমার জ্ঞানত লাইব্রেরির সময়

মোটামুটি যে কোনো সরকারী অফিসের সময় অনুসারেই হয়। তবে এখানে ঠিক তা হয় না— লাইব্রেরির সময় বিকেল ৫টা থেকে সন্ধে ৭টা পর্যন্ত। রবিবার বন্ধ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার বন্ধ থাকে। বাকি দিন খোলা। লাইব্রেরির নাম আলাপনী সাবডিভিশনাল লাইব্রেরি; ঝাড়গ্রাম। প্রথম দিন পড়তে যাই লাইব্রেরির সময় মতো— তারপরই চরম অভিজ্ঞতা। লাইব্রেরিয়ান আসেন না সবদিন, আসেন প্রতি বুধ ও শনিবার। তবে সদস্য পদ না নিলেও বই নিয়ে বসে পড়ার অধিকার সবাই পায়। সেখানে গিয়েই দেখি দুজন বসে আছেন— একজন ভদ্রমহিলা ও একজন ভদ্র ব্যক্তি। লাইব্রেরি ফাঁকা কোনো পাঠক নেই, তাই গল্পগুজব চলছে। তবে সদস্য কম নয়, মোট ৫৬০ জন। অনেকে এখনো বই নিতে আসেন, কেউ পেপার পত্রিকা পড়তে। আমি এবং আমার বন্ধু গিয়ে আমাদের যা যা প্রয়োজন তাই জানার চেষ্টা করি। তার উত্তর কিছু পাই কিছু পাইনি। একটি হল রুমের মধ্যেই বই রাখা আছে এবং সেখানেই বসে পড়ার জন্য চেয়ার এবং টেবিল রাখা আছে। বই যথাস্থানে আছে তবে বই এর ওপর ধুলোর পুরু আস্তরণ। প্রয়োজনীয় বইগুলো সংগ্রহ করি— ছেঁড়া কাপড় রয়েছে- সেগুলো নিয়ে বই ঝাড়াঝাড়ি করে পরিষ্কার করি ও যথারীতি পড়তে বসি। ঠিক সেই সময়েই ভদ্রব্যক্তি (নাম জানিনা) কথা বলা শুরু করেন, বলা যায় তাঁর গলার আওয়াজ বেশ উঁচু, একেবারে সাউণ্ড মেশিনের পাঁচ থেকে শুরু হয়। ওই ব্যক্তির ফোন বেজে ওঠে— ফোনের ওপারের ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হয় "৫০ সেম এর কি হলো ? কিছুই হয়নি ? তাহলে ২৫ সেম টা ? ঠিক আছে আমি যাচ্ছি পৌনে সাতটার সময়।" এগুলো ছাড়াও অনেক কথা, তা আর বলে লাভ নেই। আমি শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদ করে বলি যে 'কথাটা একটু আস্তে বললেও হয়'। তারপর গলার আওয়াজ একটু কমে। পড়া শেষ কেননা সময় শেষ, ৭টার সময় ফিরে আসি। পরের দিন যথা সময়েই আবার যাই- বই নিয়ে পড়তে বসি- ফোন বেজে ওঠে- আরো সেই একটি প্রশ্ন, "৫০ সেম টা কি হলো- যেটা দিয়ে এলাম"— এভাবেই এক বিরক্তিকর অবস্থায় পড়া শেষ করে ঘরে ফিরে আসি। তৃতীয় দিন অর্থাৎ বুধবার লাইব্রেরিতে পৌঁছাই। গিয়ে দেখি লাইব্রেরিয়ান এসেছেন। তাঁর সাথে কথা বলার পরই আমার চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে যায়, উন্মুক্ত হয় দুয়ার। জানতে পারি লাইব্রেরিতে শুধু মাত্র ঝাড়গ্রামের বাসিন্দারাই সদস্য হতে পারবেন এবং লাইব্রেরিতে কোনো লাইব্রেরিয়ান নেই— যিনি আসেন তিনি এক অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী। ১০ হাজার টাকা পারিশ্রমিক পান (পেনশন বাদে) এই কাজের জন্য। তিনি বলেন ঝাড়গ্রাম জেলায় মোট লাইব্রেরি ৪৩ টি, মোট কর্মচারী লাগে ৯০ জন কিন্তু আছেন মোট ১০ জন তার মধ্যে ৬ জন অবসর প্রাপ্ত কর্মচারী ও চারজন গ্রুপ-ডি এর কর্মচারী। যার মধ্যে এই লাইব্রেরির ওই ফোন ব্যক্তিও আছেন। আরো বলেন যে সরকার মনে হয় কিছু দিন পর এই লাইব্রেরি ব্যবস্থা তুলে দেবেন। ৯০ জন কর্মচারীর জায়গায় ১০ জন কিভাবে চলবে ? তাই ওনাকে তিনটি লাইব্রেরির দায়িত্ব নিতে হয়েছে প্রতি লাইব্রেরিতে দু'দিন করেই থাকেন। তবে বর্তমানে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে কিছুটা।

এরপর পুরো ব্যাপারটা মোটামুটিভাবে স্বচ্ছ জলের মতো হয়ে যায়। সত্যিই

তো এভাবে লাইব্রেরি চালানো খুব কঠিন এবং অসুবিধাজনক। বুঝতে পারি লাইব্রেরি এবং বইগুলোর অবস্থা কেন এই রকম। তারপর নিজেরা টেবিলের ধুলো ঝেড়ে, বই পরিষ্কার করে নিয়ে পড়তে বসি।

প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী বলেন— 'লাইব্রেরি এক প্রকার মনের হাসপাতাল' (বইপড়া, প্রবন্ধ)। মনের অসুখ হলে তিনি লাইব্রেরিতে আশ্রয় নেন। কিন্তু এখানে অর্থাৎ আলাপনী কেন সমগ্র ঝাড়গ্রাম জেলার লাইব্রেরির যা অবস্থা তাতে এভাবে বলা যেতেই পারে— যদি লাইব্রেরি মনের অসুখ ভালো করার হাসপাতাল হয়ে থাকে তবে এখানের রোগী হল বই। যারা ভর্তি। বইকে মানসিক রোগীতে পরিণত না করে তার ব্যবহার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অনেক মানসিক রোগী সুস্থ হয়ে উঠতে পারবে। আশা করা যায় — আমার মতো বই কিনতে না পারা অনেক ছাত্রেরও উপকারে আসবে।

❁ — ❁ — ❁

আমরা করবো জয়

(একাঙ্কিকা)

রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ছুটতে ছুটতে এক বামন বালকের প্রবেশ। তাকে তাড়া করেছে কয়েকজন বালক।

বামন— কে আছো, বাঁচাও, বাঁচাও। আমায় মেরে ফেললো।

বালকগণ— হাঃ হাঃ হাঃ, বেশ করছি মারছি। তোকে দেখলেই গা সির্ সির্ করে।

বামন— কেন ? গা সির্ সির্ করে কেন ?

প্রথম বালক— তুই আমাদের নোস্ বলে।

দ্বিতীয় বালক— তোর দাঁত, মুখ, হাত, পা সব বিশ্রী বলে।

তৃতীয় বালক— তুই একেবারে ছোট খাটো বেঁটে। তোকে দেখলেই ঘৃণা হয়। তুই আমাদের মাঝে বেমানান।

বামন— তাহলে আমি বাঁচি কি করে ? আমি যাই কোথা ?

প্রথম বালক— যা না। সার্কাসে জোকার হবি, খেলা দেখাবি।

দ্বিতীয় বালক— না হলে চিড়িয়াখানায় নাম লেখা। লোকে টিকিট কেটে দেখতে আসবে।

তৃতীয় বালক— না হলে শেষ উপায় হল— তুই মরবি যা।

বামন— তাহলে কি আমি মানুষ নই ?
বালকগণ— না-না, তুই মানুষ নোস্, অমানুষ।
বামন— তোমাদের মতোই আমার খিদে পায়। তোমাদের মতোই ঘুম পায়। তোমাদের মতোই আমি সুখে হাসি, দুঃখে কাঁদি। আমাকে খোঁচা দিলে তোমাদের মতোই ব্যাথা লাগে। তবু আমি অমানুষ ?
প্রথম বালক— তবু তুই অমানুষ।
দ্বিতীয় বালক— তবু তুই আমাদের মতো নোস্।
তৃতীয় বালক— তবু তুই সমাজের ঘৃণ্য একটা প্রাণী।
বামন— তাহলে কি সত্যিই আমার বাঁচার অধিকার নেই ?

শিক্ষক মহাশয়ের প্রবেশ।

শিক্ষক— কে বলেছে নেই ? নিশ্চয়ই আছে। ওরাও মানুষ, তুমিও মানুষ। ওদের যেমন বাঁচার অধিকার আছে। তোমারও তেমনি বাঁচার অধিকার আছে।
বামন— (শিক্ষককে প্রণাম করে) মাষ্টারমশায়!
শিক্ষক— হ্যাঁ, বাঁচার মতো বাঁচার অধিকার আছে।
বামন— তবে যে ওরা আমাকে বামন বলে!
শিক্ষক— কে বলেছে তুমি বামন ? তুমি উপেন্দ্র। তোমার জন্যই দেবতারা স্বর্গ ফিরে পেয়েছিল। তুমি বামন নও, তুমি বিরাট। তোমার এক পা সাত পাতালের নীচে, অন্য সাত স্বর্গের ওপরে।
বালকগণ— কী বলছেন আপনি ?
শিক্ষক— ঠিকই বলছি। শোনোনি তোমরা বামন অবতারের কথা ?
বামন— বামন অবতার!
শিক্ষক— হ্যাঁ, বামন অবতার। যাঁর এক পা ব্রহ্মা ধুইয়ে দিয়েছিলেন। সেই পা-ধোয়া জল থেকে গঙ্গার উৎপত্তি। গঙ্গাধর শিব যা মাথায় ধারণ করেছিলেন। ভগীরথ পূজো করে শাঁখ বাজিয়ে যাকে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলেন।
বালকগণ— সবাই যে একে অমানুষ বলে।
শিক্ষক— না, সবাই বলে না। যারা অসামাজিক তারাই বলে। যারা সামাজিক তারা একে অমানুষ বলে না। বলে—

অফিসারের প্রবেশ

অফিসার— মানুষ, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ।
প্রথম বালক— চাহিদা ? চাহিদা কিসের ?
অফিসার— স্বাভাবিক মানুষের মতো এদের অঙ্গে কোনো কিছুর অভাব থাকে। যেটার অভাব থাকে সেটারই চাহিদা হয়।
দ্বিতীয় বালক— একটু বুঝিয়ে বলুন না।
অফিসার— ঐ দেখো। সামনে একজন দাঁড়িয়ে আছে (একটি খোঁড়ার প্রবেশ) যার একটি পা খুবই ছোটো, তাহলে এর আছে পায়ের চাহিদা।

আবার দেখো ঐদিকে।

শিক্ষক— ওর একটি চোখ নেই।

অফিসার— ওর আছে চোখের চাহিদা। আবার দেখো।

শিক্ষক— এই যে ছেলেটি, এর একটি হাত নেই।

অফিসার— এর আছে হাতের চাহিদা। আর ওই যে দেখছো

শিক্ষক— ওর কানে এয়ারফোন লাগানো। ওটা না লাগালে ও মোটেই শুনতে পায় না।

অফিসার— তাই ওকে কালা বলে।

তৃতীয় বালক— ওর আছে শোনার চাহিদা।

শিক্ষক— ঠিক বলেছ। তাই এদের সবাইকে বলে—

অফিসার— বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ।

বামন— তাহলে স্যার, আমি তো সত্যিই একজন মানুষ। অমানুষ নই।

শিক্ষক— হ্যাঁ, তুমি মানুষ।

অফিসার— তোমার চাই—

বামন— একটু সহানুভূতি, বাঁচার জন্য একটু সহযোগিতা, একটু সহমর্মিতা...

(নেপথ্যে ভূপেন হাজারিকার গান বেজে ওঠে—
'মানুষ মানুষের জন্যে....'। ...সবাই স্ট্যাচু)
(স্ট্যাচু ভাব ভেঙে যায়)

খোঁড়া— আমার একটা পা ছোটো। তাই আমি স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারি না। কেউ কেউ আমাকে বিদ্রূপ করে বলে, "দেখো কেমন ড্যান্স দিচ্ছে"। খুব কষ্ট লাগে আমার।

শিক্ষক— কিন্তু কেউ কেউ তো তোমাকে ভালোবাসে। সাহায্যের হাতও বাড়ায়।

খোঁড়া— তখনই আমি ভাবি— নাঃ, আমি একা নই। আমারও বন্ধু আছে।

কানা— আমার একটা চোখ নেই। আমি কানা। এই কানা কথাটাই কখনও কখনও গালিগালাজ মনে হয়।

অফিসার— ওটাকে গালিগালাজ ভেবো না। অনেকে চোখ থাকতেও কানা। তুমি তো বুদ্ধিমান ছেলে। তাই তুমি চক্ষুষ্মান।

শিক্ষক— দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য এক চোখ নিয়েও আচার্য্য হয়ে আছেন। মৃতসঞ্জিবনী দিয়ে অনেকের প্রাণ বাঁচান।

কানা— হ্যাঁ স্যার, পাটৌডি খুব ভালো ক্রিকেটার ছিলেন।

খোঁড়া— মাসুদুর রহমান খোঁড়া হয়েও ভালো সাঁতারু।

কানা— অন্ধের পিঠে চড়ে খোঁড়া পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত।

নুলো— ভাগবত চন্দ্র শেখর পোলিওগ্রস্ত হাতেও বড় স্পিনার ছিলেন। ওয়াসিম আক্রম খুঁত হাতেও কেমন পেসার ছিলেন ?

কালা— বোবা আর কালার শত্রু নেই। তাই আমি ভাবি-সমাজের আমি

বোঝা নই। ভাবি বলেই এবছর আমি পরীক্ষায় ভালো ফল করেছি। অনেকেই আমাকে সাহায্য করেন। স্যারেরা আমায় খুবই হেল্প করেছেন। এখনও করছেন। তাই আমি শুধুই চ্যালেঞ্জড্ নই, চ্যালেঞ্জিং-ও বটি।

বামন— দেখো-সবাই কেমন আশাবাদী। এদের দেখে আমি অনেক শিখলাম। এরা সবাই আমার বন্ধু।

খোঁড়া— আর স্যার, আপনারা দুজন (শিক্ষক ও অফিসারকে দেখিয়ে) আমাদের গাইড-পথপ্রদর্শক।

কালা— আপনারাই সমাজকে পথ দেখাবেন।

নুলো— আপনাদের কাছ থেকেই অন্যরা জানতে পারবে আমাদের অবহেলা করা উচিত নয়।

কালা— আমাদের যত্ন নেওয়া উচিত।

বামন— আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

খোঁড়া— আমরাও যেন জীবনে হাসতে পারি।

কানা— মনগুলো যেন খুশিতে ভরে ওঠে।

নুলো— জীবনে যেন আমরা হারিয়ে না যাই।

কালা— আমরা যেন অন্য সকলের পাশে বাঁচার মতো বাঁচতে পারি।

বামন— আমাদের মতো সকলের কাছে আপনাদের মতো সকলেই সমাজের বন্ধু— আমাদের দিগদিশারী।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বালক— আর আমরা ?

শিক্ষক— তোমরাও এসো, এগিয়ে এসো। এদের পাশে দাঁড়াও।

অফিসার— এদের প্রতিবেশী হও। এদের সাথে হাত মেলাও।

শিক্ষক— এদের জানিয়ে দাও, বুঝিয়ে দাও—

অফিসার— তোমরা ওদের শত্রু নও, বন্ধু, সহায়ক শক্তি।

শিক্ষক— প্রতিবেশী, সহমর্মী, সহযোগী।

অফিসার— শুধু স্কুল-কলেজেই নয়। অফিসে-দপ্তরে,

বামন— সমাজের প্রতিটি স্তরে, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে।

খোঁড়া, কানা, নুলো, কানা— তোমরা আমাদের মিত্র। আমরা সবাই ভাই ভাই।

শিক্ষক ও অফিসার সামনে থাকেন। বাকিরা পাশাপাশি হাতে হাত মিলিয়ে পিছনে দাঁড়ায়।

অফিসার— সরকারি চেষ্টা তখনই সফল হয় যখন শিক্ষা ও সামাজিক মূল্যবোধ জোরদার হয়ে ওঠে। আসলে সরকারই কে আর

শিক্ষক— সমাজই বা কী ? শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা ঘটায় বিপ্লব।

বাচিক শিল্পীর প্রবেশ

শিল্পী— উন্নত সমাজ ঘটায় রক্তহীন বিপ্লব— ইভোলিউশান। আইন করে কোনো কিছু তৈরি করা যায় না। নৈতিক মূল্যবোধই আনে প্রকৃত জাগরণ। সমাজই তার আঁতুড়ঘর।

শিক্ষক— সমাজই তার ভিত্তিভূমি। আমরা সবাই সৈনিক, সবাই কর্মী।

অফিসার— প্রতিবন্ধীদের জন্য অনেক আইন হয়েছে। অনেক পথ ও প্রকল্প তৈরি হয়েছে। নতুন ভাষায় এদের বলা হয়েছে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন।

শিক্ষক— কেউ দৈহিকভাবে,

শিল্পী— কেউ মনের দিক থেকে-

অফিসার— এরা সবাই এগিয়ে আসতে চায়।

শিক্ষক— আমাদের টেনে তুলতে হবে।

বামন, খোঁড়া, কালা, নুলো ও কালা— আমরা উঠতে চাই, আমরা উঠবই।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বালক— তোমারা জাগবে, তোমরা জাগাবে।

শিল্পী— তোমরা করবে জয়, নিশ্চয়।
এইসব ম্লান, মূঢ়, মূক মুখে দিতে হবে ভাষা।
এই সব শান্ত, শুষ্ক, ভগ্ন বুকে বনিয়া তুলিতে হবে আশা।

শিক্ষক— এদের বোঝাতে হবে—

শিল্পী— মরে মরে না কভু সত্য যাহা শতশতাব্দীর বিস্মৃতির তলে
নাহি মরে উপেক্ষায়, আঘাতে না টলে।

(নেপথ্যে গান বাজতে থাকে, সবাই স্ট্যাচু হয়)

"We shall overcome, some day ..."

"আমরা করবো জয়, নিশ্চয় ..."

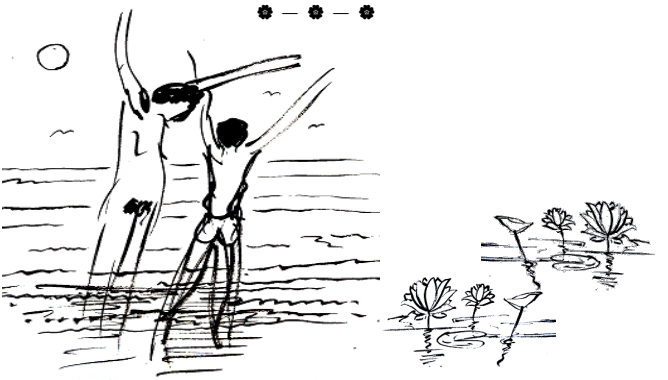

সমাপ্তি